Acc. No. 57 Shelf No. A 1 4 L 4

Title
SubTitle Narottama Carita

Role [Author ✓] [Editor] [Comment.] [Transl.] [Compiler] [ ]

Sisir Kumar Ghosa

Edition 3rd.

Publisher Pijushkanti Ghosa

Place Kalikata Year 1921 Ind.Yr. Gau 435

Lang. Bengali Script Bengali

Subject

pp. 155

P.T.O. ➡

শ্রীনরোত্তম চরিত।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

৪৩৫ গৌরাব্দ।

মূল্য ১৲ মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন।

আজ কাল পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও আমরা শ্রীল শিশির বাবুর পুস্তকাবলীর মূল্য পূর্ব্ববৎ রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে সেরূপ করা একান্ত অসম্ভব বিবেচনায় আমরা উক্ত গ্রন্থাবলীর মূল্য নিম্নলিখিত হারে বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম :—

শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত	কাগজে বাঁধাই	কাপড়ে বাঁধাই
১ম খণ্ড—	১।০	১৸০
২য় খণ্ড—	১৸০	২।০
৩য় খণ্ড	১॥০	২৲
৪র্থ খণ্ড—	১।০	১৸০
৫মখণ্ড—	১।০	১৸০
৬ষ্ঠ খণ্ড	১।০	১৸০
শ্রীকালাচাঁদ গীতা—	১॥০	২৲
শ্রীনরোত্তমচরিত	১৲	
শ্রীপ্রবোধানন্দ ও গোপালভট্ট	॥০	
শ্রীনিমাই সন্ন্যাস—	॥৵০	
সর্পাঘাতের চিকিৎসা	।০	
ঐ (ইংরাজি)—	১৲	
লর্ডগৌরাঙ্গ (ইংরাজি) ১ম—	২৲	২॥০
ঐ ঐ ২য়—	২৲	২॥০

শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ, ম্যানেজার।
২নং আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গলি,
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীনরোত্তম চরিত।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

৪৩৫ গৌরাব্দ।

মূল্য ১৲ মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ
২নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীশ্রীলাল জৈন
জৈনসিদ্ধান্তপ্রকাশক প্রেস
৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীযুক্ত ৺ হরিনারায়ণ ঘোষ* পিতা ঠাকুর
মহাশয়ের শ্রীকর কমলে :—

শিশুবেলায় লোকে আমাদিগকে বলিত যে, "তোমাদের পিতা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়। তিনি মহাপুরুষ, তোমরা ইহার উপযুক্ত পুত্র কেহ হইতে পারিবে না।" পিতা তোমার উপযুক্ত পুত্র আমরা কিরূপে হইব? তোমার মত লোক শ্রীভগবান সর্ব্বদা সৃষ্ট করেন না, আমাদের দোষ কি?

তোমার কাঞ্চন বরণ, সুবলিত অঙ্গ, কুন্দনকৃত বদন, লাবণ্যময় গতি মধুর হাস্য, কমল নয়ন যে দেখিত সেই চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় চাহিয়া থাকিত। তোমার শক্তি কত ছিল, তাহা তখন আমাদের বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু লোকে বলিত যে তোমার মত বুদ্ধিমান ভারতবর্ষে নাই। তবে তোমার হৃদয় কিরূপ ছিল, তাহা কিছু কিছু চক্ষে দেখিয়াছি। অন্যের দুঃখ শুনিলে তোমার নয়ন হইতে ধারা বহিত। তুমি যখন পূজা করিতে, তখন তোমাকে যে দেখিত, সেই ভক্তিরসে আর্দ্র হইত। সঙ্গীতজ্ঞ বহুতর লোকের গীত শুনিয়াছি, কিন্তু তোমার মুখে যে সঙ্গীত শুনিয়াছি, সেরূপ কোথাও শুনি নাই, শুনিবার

---

* যশোহর, মাগুরা গ্রামে [এখন অমৃতবাজার নামে প্রসিদ্ধ] আমার পিতা ঠাকুরের জন্মস্থান। ইনি ইহাঁর সময়ে যশোহরের সর্ব্বপ্রধান উকীল ছিলেন। ৫৫ বৎসর বয়সে ইহাঁর তিরোভাব হয়।

আশাও নাই। কিন্তু এ সমুদায় কথায় ফল কি? লোকে বলিবে যে আমি আমার পিতার গুণ বাড়াইয়া বলিতেছি। আমার কথায় প্রত্যয় কি? কিন্তু কেহ প্রত্যয় করুন বা না করুন পিতা, তোমার ক্ষতি নাই। আমারও বিশেষ ক্ষতি নাই। তোমার কৃপায় আমি জানিয়াছি যে, প্রতিষ্ঠা জলের বিম্ব হইতেও অসার। তবে পুত্রের কর্ত্তব্য পিতার নিমিত্ত কিছু স্মরণচিহ্ন রাখা। তাই ভাবিলাম যে, এই গ্রন্থখানি তোমার করকমলে অর্পণ করি।

নির্ব্বোধ জীব অন্ধ হইয়া শ্রীভগবান ভুলিয়া দুঃখে হাহাকার করিতেছে। পিতা, তুমি আমার হৃদয় জান যে, ইহা ভাবিয়া আমি বড় দুঃখ পাই। কিন্তু এই যে অভিভূত জীবকে আমি চেতন করিব, আমার সেরূপ সাধ্য নাই। তাহাই ভাবিলাম যে, সাধু-লোকের চরিত্র লিখিয়া জীবগণের চেতন করিবার চেষ্টা করিব। সেই নিমিত্ত ঠাকুর মহাশয়ং নরোত্তমের চরিত্র লিখিলাম। যিনি শ্রীভগবানের পাদপদ্মমধু জিহ্বাগ্রে একবার আস্বাদ করিয়াছেন, তাঁহার এ জগতে কোন দুঃখ নাই। যদি এই গ্রন্থ পড়িয়া কাহার মন ভগবানের শ্রীচরণে আকৃষ্ট হয়, তবে আমার শ্রম সার্থক।

পিতা, এই গ্রন্থখানি তোমার শ্রীকরে দিলাম।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষি পুত্র,

শ্রীশিশিরকুমার দাস ঘোষ।

শ্রীনরোত্তম চরিত।
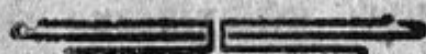
শ্রীলোকনাথ গোস্বামী।

—*—

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তখন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন, তিনি শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থ লিখিবেন সঙ্কল্প করিয়া, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর নিকট অনুমতি লইতে গমন করিলেন। শ্রীলোকনাথের ভজনেই দিবানিশি যাইত, কাহারও সহিত বাক্যালাপের সময় ছিল না। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রার্থনা জানাইলে, তিনি অতি সুখে অনুমতি দিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে একটী নিষ্ঠুর আজ্ঞা করিলেন। তিনি ঐ চরিতামৃত গ্রন্থে তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পাছে তাঁহার কোনরূপ প্রতিষ্ঠা হয় বলিয়া শ্রীলোকনাথ গোস্বামী এরূপ আজ্ঞা করিলেন, আর আমরা হতভাগ্য জীবগণ সেই নিমিত্ত তাঁহার নির্ম্মল জীবনের ঘটনা গুলি জানিতে পারিতেছি না।

যশোহর জেলায় তালখড়ি জাগলি গ্রামে মহা কুলীনব্রাহ্মণ পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সীতা। ইহাদের একমাত্র পুত্র লোকনাথ। পদ্মনাভ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য, এবং তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতেন। লোকনাথ অতি অল্প বয়সে মহাপণ্ডিত হইলেন। পিতা সাধু, মাতাও সাধ্বী, লোকনাথ শিশু কালেই ভক্তিরসে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। সংসারে ঔদাস্ত, অতিশয় পাণ্ডিত্য, কৃষ্ণকথায়

রুচি, ভক্তি-শাস্ত্র-অধ্যয়ন, এসমস্ত দেখিয়া সকল লোকে তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন তিনি শুনিলেন যে, শ্রীনবদ্বীপে শচীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্ব-নয়নগোচর হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র লোকনাথ তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন। শুনিবামাত্র তাঁহার মনে প্রতীতি হইল, সত্যই শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে শ্রীকৃষ্ণ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি যাঁহাকে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া যোগীঋষিগণ ধ্যানে দর্শন করিতে পান না, সেই পরম বস্তু তাঁহার গ্রামের দুই দিবস দূরে সর্ব্ব-নয়নগোচর হইয়াছেন। ইহা মনে করিয়া লোকনাথ তাঁহার নিকট যাইবার নিমিত্ত অধীর হইলেন। সেই সঙ্গে সকল বিষয়ে তাঁহার ঔদাস্য উপস্থিত হইল।

মাতা পিতা পুত্রের ভাব দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। অল্প বয়স, পরম পণ্ডিত, পরম সাধু, পরম সুন্দর একমাত্র পুত্র যৌবনের প্রারম্ভে যদি ধর্ম্মে উন্মত্ত হয়, তবে তাহার মাতা পিতা কিরূপে তাহা সহ্য করিবেন? শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে গেলে আর কি সে ফিরিয়া আসিবে? পদ্মনাভ ও সীতা ইহাতে পুত্রকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। তাঁহারা পরামর্শ করিলেন যে পুত্রকে বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

লোকনাথ এই কথা শুনিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া গৃহত্যাগ করিবেন, দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। লোকনাথ শুনিলেন, শ্রীকৃষ্ণ জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার জীব সমুদায় কুপথে যাইতেছে, ইহাতে ব্যথিত হইয়া, তাহাদের প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া, তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে স্বয়ং মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন। যাঁহার মনে এরূপ বিশ্বাস হইয়াছে তিনি আর মাতা

পিতার কথায়, কি সংসার সুখের লোভে, কেন গৃহে থাকিবেন ? তাঁহার কি আবার সংসারবাসনা, লোভ, ভয় ও দৌর্ব্বল্য থাকিতে পারে ? তাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়াছে। মাতা পিতার বাৎসল্যজনিত ভ্রান্তি নিমিত্ত লোকনাথের মনে তাঁহাদিগের জন্য দুঃখ হইত বটে, কিন্তু সে দুঃখ তিনি মনে করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবেন, তাহাতে আবার বাধা কি ?

অগ্রহায়ণ মাস, রাত্রে তিনি শয়ন করিয়াছেন। সকলে নিদ্রা গেলে লোকনাথ উঠিলেন ; আঙ্গিনায় আসিয়া নিদ্রিত মাতা পিতাকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন, ও মনে মনে তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এইরূপে জন্মের মত মাতা পিতা ও গ্রাম হইতে বিদায় লইয়া শ্রীনবদ্বীপের দিকে দ্রুতবেগে চলিলেন। অষ্ট ক্রোশ পথ আসিলে প্রভাত হইল, তিনি সন্ধ্যাকালে শ্রীনবদ্বীপে পহুছিলেন।

এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন বলিয়া, শ্রীলোকনাথের আনন্দে ও নানাবিধ ভাবোল্লাসে কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। কিন্তু শ্রীনবদ্বীপে প্রবেশ করিয়া মনে উদ্বেগ উপস্থিত হইল। "প্রভুর বাড়ী কোথা" জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি যতই প্রভুর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতেছেন ততই তাঁহার উদ্বেগ বাড়িতেছে। উদ্বেগের কারণ এই, "কৃষ্ণ কি আমাকে দেখা দিবেন ? তিনি কি আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিবেন ? আমি তাঁহার ভক্ত নই ও কখন তাঁহাকে ভজন করি নাই। হে কৃষ্ণ ! আমি পামর, তাই বলিয়া আমাকে কি গ্রহণ করিবে না ?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে লোকনাথ প্রভুর বাটীর দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভিতর প্রকোষ্ঠে। লোকনাথ আর চলিতে পারেন না। কষ্টেশ্রষ্টে আঙ্গিনা পর্য্যন্ত গেলেন। শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ পিঁড়ায় বসিয়া আছেন। লোকনাথ

আঙ্গিনায় আড়ষ্ট হইয়া প্রভুর বদন পানে চাহিয়া রহিলেন। কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। শ্রীকৃষ্ণকে যাহা যাহা বলিবেন বলিয়া, তিনি পথে যোজনা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার এক অক্ষরও মনে রহিল না।

শ্রীগৌরাঙ্গ পিড়া হইতে বিদেশী ব্রাহ্মণকুমারকে দেখিয়া, আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না। অন্তর্য্যামী প্রভু দুইবাহু প্রসারিয়া নীচে আসিয়া লোকনাথকে ইহাই বলিয়া কোলে লইবেন, "লোকনাথ! তুমি কেমন করিয়া এতদিন আমাকে ভুলে ছিলে?"

প্রভু, তুমি যে এই অপরিচিত ব্রাহ্মণ যুবককে তিরস্কার কর, ইহার হেতু কি? তুমি কে? লোকনাথের সহিত তোমার সম্বন্ধ কি? ইহার উত্তর দিতেছি। যখন কোন গোপী অন্য গোপীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, "হে সখি! তুমি কৃষ্ণ কিরূপে পাইলে?" তখন সেই সখী উত্তরে বলিতেছেন—

শুন সই মনের মরম।ধ্রু
একদিন জাতি কুল রাখিয়া ছিলাম গো,
হাতে হাতে মজাইলাম কুলের ভরম।
কানু সেই কালিন্দী তীরে, মুই গেনু যমুনা নীরে
গা খানি মাজিতেছিলাম একা।
মাজিতে মাজিতে অঙ্গ বিমল হইল গো,
তবে শ্যাম আসি দিলেন দেখা।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার দাসদিগের সহিত বড়ই সম্প্রীতি। কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। প্রভুর কথার ইহা বুঝি যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও লোকনাথ তাঁহার চিরদাস।

লোকনাথ প্রভুর কোলে মূর্চ্ছা গেলেন।

এইরূপে লোকনাথ পঞ্চদিবস প্রভুর সহিত রহিলেন। দিবানিশি তাঁহার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান রহিল না। এই পঞ্চদিবস প্রভুর সহিত থাকিয়া তাহার পুনর্জ্জন্ম হইয়া গেল, তাঁহাতে লোকনাথত্ব আর কিছু রহিল না। প্রভু তাঁহার সমুদয় ধমনী দিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, আর তখন তিনি ব্রজগোপী হইলেন। পঞ্চদিবস পরে প্রভু লোকনাথকে বিরলে লইয়া বসিলেন।

প্রভু ধীরে ধীরে লোকনাথের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিতেছেন, "লোকনাথ তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেখানে যাইয়া বাস কর।"

এই কথা শুনিয়া ঐ পঞ্চদিবস পরে লোকনাথের বিভোর অবস্থা ঘুচিয়া গেল। তিনি প্রভুকে বলিলেন, "আমাকে আপনি আজ্ঞা করিতেছেন; আমি আপনাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? আপনাকে ছাড়িয়া গেলে প্রাণ বিয়োগ হইবে।"

প্রভু বলিলেন, "লোকনাথ তুমি দুঃখিত হইও না। তুমি সুখ-ভোগ করিতে এ জন্মগ্রহণ কর নাই, আমিও না। এই অগ্রহায়ণ মাস প্রায় গেল, মাঝে পৌষ মাস, মাঘ মাসে আমি দণ্ডকৌপীনধারী হইয়া গৃহের বাহির হইব। তুমি অগ্রে বৃন্দাবনে গমন কর, তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্যান্য ভক্তগণ যাইবেন। শ্রীবৃন্দাবনের যে দশা হইয়াছে তাহা হইতে তোমরা তাঁহাকে মুক্ত কর। পশ্চিমদেশে ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার কর ও লুপ্ততীর্থ সমুদয় উদ্ধার কর, আমিও তোমার পশ্চাৎ বৃন্দাবনে যাইতেছি।"

তখন লোকনাথ সজলনয়নে প্রভুর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "প্রভু যে আজ্ঞা, আমি চলিলাম, আপনার আজ্ঞাপালনই আমার সুখ ও কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। আমার কি করা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলুন।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক নিগূঢ় কথা কহিলেন, এবং তাহা শুনিবামাত্র লোকনাথের হৃদয়ে সমুদয় বৃন্দাবন লীলা একেবারে স্ফূর্ত্তি পাইল। প্রভু বলিলেন, "তুমি চীরঘাটে যাও, সেখানে কদম্ব তমাল ও বকুল সুশোভিত যে কুঞ্জ তাহা তোমার। তুমি সেখানে বাস করিবে।"

প্রভাতে লোকনাথ মহাপ্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া বিদায় মাগিলেন। লোকনাথ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেখানে পণ্ডিত গদাধর ও তাঁহার শিষ্য ভূগর্ভ ছিলেন। গদাধরও ক্রন্দন করিতেছেন। কিন্তু ভূগর্ভের অনুরূপ ভাব হইল। তিনি বলিলেন, "প্রভু! আমাকেও আজ্ঞা করুন, আমি ইঁহার সঙ্গে বৃন্দাবন যাই।" শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাতে গদাধর পানে চাহিলেন। চাহিয়া বলিলেন, "গদাধর! তুমি কি বল?"

পণ্ডিতগোসাঞি গদাধর অনুমতি দিলেন, আর তখনই সেই দুই ব্রাহ্মণ যুবক বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। লোকনাথের মাতা পিতা দেশে থাকিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার আর এ জগতের কোন কথা মনে রহিল না। দুই জনে কান্থা ও কৌপীনধারী হইয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। এক কপর্দ্দকও সম্বল নাই, কখনও গৃহের বাহির হন নাই। শ্রীবৃন্দাবন দুইমাসের পথ দূরে। সে দেশে বাঙ্গালী কেহ নাই। ইঁহারা সে দেশের ভাষা পর্য্যন্তও জানেন না। দুইজনে জন্মের মত দেশ, নিজ জন ও সংসার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, শুদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। এই সমস্ত বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন যে ইহারা আমাদের জাতীয় লোক নহেন। আবার ইহারা যাঁহার দাস, তিনি কি বস্তু, তাহাও কিছু অনুভব করিতে পারিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথকে নিজসঙ্গ ছাড়াইয়া কেন বৃন্দাবনে পাঠাইলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার মন কেবল তিনিই জানেন। তবে যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহা উপযুক্ত সময়ে বলিব।

লোকনাথ ও ভূগর্ভ রাজমহল পর্য্যন্ত গমন করিলেন। সেখানে শুনিলেন যে, বৃন্দাবন যাইবার পথ খোলা নাই। হিন্দু মুসলমানে তখন সর্ব্বস্থানে যুদ্ধ হইতেছে, ইহাতে রাজপথ সমুদায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সামান্য বাধায় তাঁহারা ফিরিবার লোক নহেন। অনেক অনু-সন্ধানের পর তাঁহারা বহুদেশ ঘুরিয়া বৃন্দাবনে যাইবার পরামর্শ করিলেন।

এই মনে করিয়া তাজপুরের পথ ধরিলেন। সেখান হইতে পুর্ণিয়া গমন করিলেন, ও ক্রমে ঘুরিয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ হইতে আগরায় গমন করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান গোকুলে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

পরে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে বৃন্দাবন জঙ্গলময় ও হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি হইয়াছে। যাহারা বৃন্দাবনবাসী তাহারা অজ্ঞ, মূর্খ ও ভক্তিহীন। কোথা কি লীলার স্থান, তাহা কিছুই বলিতে পারে না। বৃন্দাবন তখন ছারখারে গিয়াছে। মুসলমানগণের ভয়ে হিন্দুগণ তাঁহাদের দেবতা লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। কেহ বা শ্রীবিগ্রহ লইয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনে আছেন কেবল যমুনা, গোবর্দ্ধন ও স্থানটী অর্থাৎ যাহা তাহারা লইয়া যাইতে পারেন নাই। দুই বন্ধু তখন উচ্চৈঃ-স্বরে রাধাকৃষ্ণ ও সখীগণকে আহ্বান করিতে করিতে বন-ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। "হে কৃষ্ণ! আমাদের প্রতি করুণা কর। হে রাধে! আমরা তোমার অন্বেষণে আসিয়াছি। হে ললিতে! হে বিশাখে! তোমরা কোথায়? আমরা কি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব? হে লীলাস্থান! আমাদের প্রতি সদয় হও। তোমরা সকলে কোথায়? কোথায় বংশীবট? কোথায় নিধুবন? কোথায় ভাণ্ডীর বন?

কোথায় শ্যামকুণ্ড? কোথায় রাধাকুণ্ড? হে গৌরাঙ্গ প্রভু! আমাদের কিরূপ আজ্ঞা করিলেন? এ আজ্ঞা আমরা কিরূপে সাধন করিব? প্রভু! আমরা তোমার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলাম, অথচ তোমার আজ্ঞা-পালন করিতে পারিলাম না" ইহা বলিয়া এই দুই বিদেশী যুবক বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

বৃন্দাবনবাসিগণ দেখিলেন যে দুইজন অতি অল্পবয়স্ক, পরম সুন্দর ব্রহ্মচারী (তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত ছিল) পাগলের ন্যায় রোদন করিয়া বেড়াইতেছেন। ক্রমে ক্রমে গ্রামবাসিগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কারণ এরূপ দৃশ্য দর্শন করিয়া সকলে আকৃষ্ট হয়েন।

তাঁহাদের ভাবব্যাকুলতা দেখিয়া ব্রজবাসিগণ বিস্মিত হইলেন ও সকলে আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রজ-বাসিগণকে অতি কাতরভাবে কৃষ্ণের স্থান দেখাইতে বলিলেন। তাঁহারা আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "রাধাকৃষ্ণ ও সখীগণ কোথা লুকাইয়া আছেন তাহা ত তোমরা ব্রজবাসী অবশ্য বলিয়া দিতে পার?"

তখন চতুর্দ্দিকে ধ্বনি হইল, ও সহস্র সহস্র লোক আসিয়া তাঁহা-দিগকে প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইল ও সকলে তাঁহাদের বাসোপযোগী স্থান প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল জীবন ধারণের নিমিত্ত যাহা কিছু ভক্ষণ করিতেন, কোনরূপ ভোগবাসনা তাঁহাদের ছিল না। গৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে তাঁহারা একেবারে অসম্মত হইলেন।

যথা নরোত্তম বিলাসে—

"ব্রজবাসী বিপ্র অনুরোধে যথাকালে।
ফলাদি ভক্ষণ করে রহে বৃক্ষতলে॥

এক স্থানে স্থির হয়ে কভু নাহি রয়।
বৃন্দাবন প্রদেশেতে ভ্রমণ করয়॥"

দুই বন্ধু ভাবিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ চীরঘাটে বাস করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহারা এখন চীরঘাট কোথা পাইবেন। "হে চীরঘাট! তুমি কোথায়? হে শ্রীরাধার সখীগণ! আমাদের প্রভুদত্ত স্থান দেখাইয়া দাও।" এইরূপ দিবানিশি তল্লাস করিয়া পরিশেষে প্রভুদত্ত স্থান পাইলেন। কিরূপে পাইলেন তাহা জানি না, তবে অনুভব করিতে পারি। তখন সেই স্থানকে প্রণাম করিয়া বৃক্ষতলে বসিলেন। সেই-খানেই তাঁহাদের চিরজীবন বাস করিতে হইবে। ইহা মনে করিয়া ভাবিতেছেন, যথা প্রেম বিলাসে—

"আর না দেখিব গোরা তোমার চরণ।
রহিলাম আজ্ঞামাত্র করিয়া ধারণ॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু যে করিলা লীলা।
বঞ্চিত করিয়া মোদের এথা পাঠাইলা॥"

এই প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের দূত বৃন্দাবন প্রবেশ করিলেন। এই প্রথমে বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার হইতে আরম্ভ হইল। এই প্রথমে বহুদিন পরে আবার পশ্চিম দেশে ভক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। আর এই প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে প্রকাশ পাইলেন। এখন বৃন্দাবনে অনেক শ্রেণীর লোক প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু এই যে নব বৃন্দাবন, ইহা আমাদের প্রভুর সৃষ্টি।

যখন ভূগর্ভ ও লোকনাথ বৃন্দাবন প্রবেশ ও কতক লুপ্ততীর্থ আবিস্কার করিতেন, তখন সুবুদ্ধি মিশ্র বৃন্দাবনে গমন করেন নাই, সনাতন ও রূপ রাজকার্য্য করিতেছেন, গোপালভট্ট পিতৃসেবা করিতে-ছেন, আর রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও জীব তখন বালক। শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রভুর জয়ধ্বজা বৃন্দাবনে প্রথমে এই ১৪৩২ শকে লোকনাথ ও ভূগর্ভ প্রোথিত করিলেন। বৃন্দাবনে তখন এই দুই জন মাত্র বাঙ্গালী ছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথকে অগ্রহায়ণ মাসে বিদায় দিয়া মাঘ মাসে আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সেখান হইতে দক্ষিণে গমন করিয়া দুই বৎসর ভ্রমণ করিলেন। আবার নীলাচলে আসিয়া বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া শ্রীনবদ্বীপ হইয়া, গঙ্গার ধারে ধারে গৌড়ের নিকট পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখান হইতে, প্রভু কোন কারণে শ্রীবৃন্দাবনে গমন না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, করিয়া আবার নীলাচলে আসিলেন। তাহার কিছুকাল পরে প্রভু নীলাচল হইতে ঝানিখণ্ডের অর্থাৎ জঙ্গলের পথ দিয়া (ছোটনাগপুর হইয়া) বৃন্দাবনে গমন করিলেন। আর সেখানে দুই মাস থাকিয়া আবার নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভু-বৃন্দাবনে গমন করিলেন, কিন্তু লোকনাথ ও ভূগর্ভের সহিত তাঁহার দেখা হইল না। তাহার কারণ বলিতেছি।

ভূগর্ভ ও লোকনাথ লোকমুখে শ্রবণ করিলেন যে, প্রভু সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে গিয়াছেন; পরে শুনিলেন যে তিনি দক্ষিণদেশে গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আর তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না; প্রভুকে দর্শন করিবেন বলিয়া, দক্ষিণ দেশে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে চলিলেন। দক্ষিণে অন্বেষণ করিতে করিতে শুনিলেন যে, প্রভু বৃন্দাবন গিয়াছেন তখন তাঁহারা দ্রুতগতিতে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন; আসিয়া শুনিলেন যে, প্রভু কয়েক দিন পূর্ব্বে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন!

এইরূপে বার বার প্রভু-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া লোকনাথ নিতান্ত কাতর হইলেন। তিনি আর প্রভুর তল্লাসে আসিলেন না। শুনিতে

পাই যে প্রভু স্বপ্নে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। প্রভু তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, "এই যে তুমি আমার মূর্ত্তি দেখিতেছ, এই মূর্ত্তি তুমি নবদ্বীপে দেখিয়াছ। কিন্তু আমার এখন সে মূর্ত্তি নাই। এখন আমি কাঙ্গালের মূর্ত্তি ধরিয়াছি, তুমি তাহা দেখিলে বড় দুঃখ পাইবে। অতএব তোমার হৃদয়ে যে মূর্ত্তি আছে তাহাই থাকুক। আমার এখনকার এ মূর্ত্তি তোমাকে দেখাইব না। আর সেই নিমিত্ত তোমাকে আমি দর্শন দিই নাই।"

লোকনাথের দুঃখ হইবে বলিয়া প্রভু তাঁহাকে দর্শন দেন নাই। লোকনাথ তখন বুঝিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গে ছেড়া কাঁথা ও কটি-বেড়া দড়ি ও কৌপীন, ইহা না দেখাই ভাল হইয়াছে। তিনি চর্ম্মচক্ষে প্রভুকে দর্শন করিবার চেষ্টা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। সেই অবধি লোকনাথ ও ভূগর্ভ নিশ্চিন্ত হইয়া বৃন্দাবনে চীরঘাটে বাস করিতে লাগিলেন; দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, আর দুই চারি দণ্ডমাত্র নিদ্রা যান। কাহার সহিত তাঁহাদের বাক্যালাপ নাই, আহারের চেষ্টা নাই, যাহা আপনা আপনি আইসে তাহাই আহার করেন, কিছু না আইসে উপবাস করিয়া থাকেন।

তখন ইহারা দুইজন মাত্র বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তৎপর স্বয়ং প্রভু আসিলেন, সুবুদ্ধি রায় আসিলেন, সনাতন আসিলেন, রূপ আসিলেন ও ক্রমে ক্রমে মহাপ্রভুর ভক্তগণ আসিয়া সমস্ত বৃন্দাবন অধিকার করিয়া লইলেন। বৃন্দাবনের সমুদয় লুপ্ততীর্থ উদ্ধার হইল; লুপ্ত শ্রীবিগ্রহ পুনরুদ্ধার ও নূতন বিগ্রহ স্থাপিত হইল; এমন কি, শেষে মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন ও সেবা আরম্ভ হইল। এইরূপে জঙ্গলময় বৃন্দাবনে মন্দির স্থাপিত হইতে লাগিল। ক্রমে সে পবিত্রস্থান মন্দিরময় হইয়া গেল। গোস্বামিগণ যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তাঁহাদের

সম্বল ছেড়া কাঁথা কম্বল। কিন্তু তাঁহারা যে গোবিন্দ দেবের মন্দির করিলেন, তাহার ন্যায় প্রাসাদ জগতে আর নাই; তাহার মূল্য এক কোটি টাকা।

এইরূপে শ্রীলোকনাথ চিরজীবন অতিবাহিত করিলেন, কাহাকেও শিষ্য করিলেন না। এই প্রতিজ্ঞা কিন্তু শেষে তাঁহার ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল।

খেতরি।

রামপুর বোয়ালিয়া সহরের ৬ ক্রোশ দূরে গড়েরহাট পরগণায় খেতরিগ্রাম পদ্মা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ আন্দাজ দূরে। এখন ইহা শ্রীবিহীন, কিন্তু এক সময়ে ইহা একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই স্থানের অধিপতি ছিলেন দুই ভ্রাতা,—শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত ও শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত, উপাধি মজুমদার। শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত জ্যেষ্ঠ। ইঁহারা উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ। তখন মুসলমানেরা বাঙ্গালা অধিকার করিয়া লইয়াছে। তবে মুসলমান রাজগণ আভ্যন্তরিক রাজ্যশাসন বড় একটা করিতেন না, তাঁহাদের অধীনস্থ হিন্দুরাজগণ তাহা করিতেন। মুসলমান রাজগণ শুদ্ধ করগ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। খেতরির রাজ্য এক জন মুসলমান জায়গীরদারের অধীনে ছিল। শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত এই জায়গীরদারকে কর দিতেন।

মাঘি-পূর্ণিমার গোধূলি-লগ্নে, (কেহ কেহ বলেন মাঘি শুক্ল পঞ্চমীতে কৃষ্ণানন্দ দত্তের একটী পুত্র সন্তান হইল। কোন্ শকে এই পুত্র হইল, তাহা ঠিক করা যায় না। তবে তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকট আছেন। রাজা পুত্রের কল্যাণের নিমিত্ত ও মনের আনন্দে নানাবিধ উৎসব করিলেন। এই পুত্রের নাম রাখিলেন শ্রীনরোত্তম। পিতা মাতা আদর করিয়া "নরু" বলিয়া ডাকিতেন।

নরুর প্রকৃতি অতি শান্ত, বুদ্ধি সতেজ ও রূপ অতি মনোহর; শ্যাম বর্ণ, কমল-নয়ন, সুবলিত-অঙ্গ। নরু খেতরিবাসিগণমাত্রেরই প্রাণধন-হইয়া উঠিলেন। একে রাজকুমার, তাহাতে রাজকুমারের যাহা যাহা

থাকা উচিত, তাহা সমুদয়ই তাঁহাতে ছিল। পিতা অল্প বয়সে তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে লাগিলেন। পিতা মাতার আদরে রাজকুমারের স্বভাব বিকৃতি হওয়া দূরে থাকুক, আপনি তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাজকুমার ক্রমে বিদ্বান ও সকলের প্রিয় হইতে লাগিলেন। সেই সময়ে খেতরিগ্রামে কৃষ্ণদাস নামক এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সমকালীন লোক, ও তাঁহার একান্ত ভক্ত। তাঁহার মধুর ব্যবহারে রাজকুমার তাঁহার প্রতি নিতান্ত আকৃষ্ট হইলেন। নরোত্তম তাঁহার নিকট শ্রীনবদ্বীপের অবতারের কথা শুনিলেন। এই অবতারের কথা শুনিয়া রাজকুমারের অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। যদি এইরূপ কথা মনে বিশ্বাস হয়, যে শ্রীভগবান্ আমাদের মধ্যে উদিত হইয়াছেন, তবে অঙ্গ শিহরিয়া উঠিবার কথা বটে।

নরোত্তম বলিতেছেন, "তিনি কি প্রকার, আমাকে সব বলুন। তিনি কবে আসিয়াছিলেন, তিনি কি করিলেন, নদিয়া কোথায়, আমি কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব, তিনি কি এখন আছেন?" রাজকুমার এইরূপে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের নানা কথা শুনিতে শুনিতে রাজকুমারের ভাবের দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাঁহার নিকট এই কাহিনী এত মধুর লাগিল যে, ইহা শুনিতে থাকিলে আহারের কি দেহের অন্য কোন চেষ্টা তাঁহার থাকিত না, আবার মাঝে মাঝে অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিত। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার নিজ জনকে স্বপ্ন দেখিতেন। দিবাভাগে কেবল তাহাই ভাবিতেন, আর তাঁহার লীলা কথা ব্যতীত অন্য কিছুই তাহার ভাল লাগিত না।

যখন শুনিলেন যে, নিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তখন রাজকুমার

অধীর হইয়া এরূপ রোদন করিতে লাগিলেন যে তাঁহার জীবন সংশয় ভাবিয়া কৃষ্ণদাস ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তখন অপ্রকট হইয়াছেন, তাঁহাকে আর চর্ম্মচক্ষে দেখিবার যো নাই, ইহা ভাবিয়া রাজকুমার আপনাকে বড়ই দুর্ভাগ্য বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আর কিছু দিন পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি শ্রীভগবানের দর্শন পাইতে পারিতেন, এই কথা ভাবিয়া রাজকুমারের হৃদয় বিদীর্ণ হইলে লাগিল। কৃষ্ণদাস তাঁহাকে আরও বলিলেন যে, তাঁহার পার্ষদগণ প্রায় সকলেই অদর্শন হইয়াছেন, আর যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত সকলেই প্রভুর অদর্শনে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন। রাজকুমার আরও শুনিলেন যে, নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শনে স্বরূপ ও গদাধর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দামোদর শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত নিযুক্ত আছেন। জগদানন্দ, বক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, গোবিন্দ প্রভৃতি আর গৌরশূন্য নীলাচলে তিষ্ঠিতে না পারিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পলায়ন করিয়াছেন! আর শুনিলেন, প্রভু সঙ্গোপনের পরে বৃন্দাবনে লুকাইয়া আছেন। এই সমস্ত শুনিয়া নরোত্তম ভাবিলেন যে, অগ্রে তাঁহার বৃন্দাবনে যাওয়াই কর্ত্তব্য। সেখানে হয়ত স্বয়ং প্রভুকেও দেখিতে পাইবেন॥

রাজকুমার ভাবিতেছেন, তাঁহার কি বৃন্দাবন দর্শন হইবে। তিনি কি শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ দর্শন পাইবেন? কখন কখন রাজকুমার পদ্মাবতীর তীরে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তিনি কৃষ্ণদাসের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোক লইয়া নৃত্য করিতে করিতে পদ্মার অপর পারে আসিয়াছিলেন। নরোত্তম পদ্মার এ-পার থাকিয়া ও-পারে চাহিয়া থাকিতেন। এইরূপে কিছুক্ষণ পরে বিহ্বল হইতেন, আর দেখিতেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ লক্ষ লক্ষ

লোক লইয়া ও-পারে হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। যখন তাঁহার এই দর্শন হইত, তখন তিনি পরমানন্দে ভাসিতেন। যখন আবেশ ভাঙ্গিয়া যাইত, তখন কাতর হইয়া রোদন করিতেন ও গৌরাঙ্গকে আহ্বান করিতেন।

নৃপতি কুমার এক দিবস পদ্মা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। যাইয়া আর বাড়ী আসিলেন না। ইহাতে তাঁহার তল্লাস পড়িল। মাতা পিতা অনুসন্ধানে শুনিলেন, নরু পদ্মায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। তখন সশঙ্ক, হইয়া তাঁহারা বহু লোকজন সমভিব্যাহারে পদ্মার ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে একটী বালক সেখানে নৃত্য করিতেছেন। সে বালকটীকে চিনিতে না পারিয়া সকলে ইতস্ততঃ রাজকুমারের তল্লাস করিতে লাগিলেন।

তখন নরোত্তমের মাতা, পুত্র পদ্মায় ডুবিয়া মারা পড়িয়াছে এই আশঙ্কা করিয়া, "নরু, নরু" বলিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। "নরু, নরু" বলিয়া চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন নৃত্যকারী বালকটী নৃত্য সম্বরণ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বে যেরূপ বাহ্যজ্ঞান শূন্য ছিল, "নরু নরু" ডাক শুনিয়া, সেই বালক কথঞ্চিত চেতন পাইলেন। তখন দৌড়িয়া মাতার কাছে আসিয়া বলিলেন, "মা, তুমি কান্দিতেছ কেন? এই তো আমি আছি।"

তখন ঘাটে বহু লোক সমবেত হইয়াছেন। সকলেই রাজকুমারের নিমিত্ত হাহাকার করিতেছেন। বালকের বাক্য শুনিয়া সকলে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখেন যে, তিনি রাজকুমারই বটে; তবে বর্ণ শ্যাম ছিল, তখন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হইয়াছে, আর মনের মধ্যে ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হওয়াতে মুখের অবয়বের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাহাতেই তাঁহাকে প্রথম কেহ চিনিতে পারেন নাই। রাণী নারায়ণী পুত্রকে চিনিতে

পাসিয়া বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে কোলে লইলেন, ও মুখে শত শত চুম্ব দিলেন। কিন্তু রাজকুমার আবার বিহ্বল হইয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে কোলে করিয়া গৃহে লইয়া আসা হইল, এবং তিনি ক্রোড়ে অতি করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

বাড়ীতে আনিয়া মাতা পুত্রকে উত্তম শয্যায় শয়ন করাইলেন, ও তাঁহাকে বায়ুব্যজন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার মুখ ফুলাইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আর তাঁহার জননী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছেন; বলিতেছেন, "বাপ, তুমি কান্দ কেন, তোমার কি দুঃখ হইয়াছে বল, আমি যেমন করিয়া পারি তোমার দুঃখ মোচন করিব। তুমি সুবোধ, তোমার রোদন শুনিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, ইহা বুঝিতেছ না কেন?" নরোত্তম শুনিতেছেন কিন্তু কোন ক্রমে রোদন সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না, কাজেই উত্তর দিতেও পারিতেছেন না।

রাজকুমার ক্রমে শান্ত হইলেন, শান্ত হইয়া আহারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন মাতা আনন্দিত হইয়া পুত্রকে নানাবিধ আহারীয় আনিয়া দিলেন। আহারের পর নরোত্তম সুস্থ হইয়া মাতা পিতাকে বলিতে লাগিলেন, "আমি প্রায় অচেতন অবস্থায় অন্ত প্রাতে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিলাম। আমি স্নান করিবামাত্র আমার কি একরূপ ভাব হইল। আমি দেখিলাম যে, গৌরবর্ণ কোন একজন পরম সুন্দর বালক নৃত্য করিতে করিতে আমার কাছে আসিলেন, আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, আর অমনি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তিনি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে নৃত্য করাইতে লাগিলেন, আর আর আমি আনন্দে কান্দিতে লাগিলাম। তাহার পর আমার আর কিছু মনে নাই। তাহার পরে মা, তোমার ক্রন্দন

রাজকুমারের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মাতা পিতা নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। এদিকে পুত্রের কোন পীড়া নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অঙ্গের সৌন্দর্য্য ও তেজ শত গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন প্রকার উন্মাদের চিহ্ন নাই, কিন্তু তবু পুত্র যে অপ্রকিতস্থ হইয়াছেন তাহা সকলেই বেশ বুঝিতে পারিতেছেন; কারণ তাঁহারা দেখিতেছেন যে নরোত্তমের সর্ব্ব সুখে ও সর্ব্ব বাসনায় বিরক্তি হইয়াছে, কেবন তিনি একটি বাসনায় অভিভুত হইয়াছেন। সেটি এই যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে কিরূপে যাইবেন। আবার মাঝে মাঝে তিনি অহেতুক করুণ স্বরে ক্রন্দন করেন, ও তাহা শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কখন বা ক্রন্দন করিয়া তাহার পরে অট্ট অট্ট হাস্য করেন। মাঝে মাঝে অঙ্গ পুলকিত হয়, আর কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। জিজ্ঞাসা করিলে রাজ-কুমার কিছু বলিতে পারেন না। কেবল বলেন তাঁহার সমবয়স্ক অতি গৌরবর্ণ একজন কে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে কান্দাইয়া, হাসাইয়া ও বিহ্বল করাইয়া থাকেন।

মাতা পিতা ইহাতে সাব্যস্ত করিলেন যে, পদ্মাবতীর তীরে নির্জ্জন স্থান পাইয়া পুত্রের হৃদয়ে কোন এক অপদেবতা প্রবেশ করিয়াছে। ইহা ভাবিয়া তাঁহারা দেশ দেশান্তর হইতে নানাবিধ ওঝা আনিতে লাগিলেন। এই ওঝাগণ যাহা বলিলেন, মাতা পিতা অনুরোধে রাজকুমার তাহা করিতে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু পীড়ার কিছুমাত্র উপশম হইল না। একজন কবিরাজ শিবাদি ঘৃত ব্যবস্থা করিলেন। রাজকুমার বলিলেন যে, "যদি আমার রোগ প্রতিকারের নিমিত্ত জীব-হত্যা করা হয়, তবে আমি পদ্মায় ঝাঁপ দিয়া মরিব।" কাজেই শিবাদি ঘৃত করা হইল না। রাজকুমার মাতা পিতাকে বারম্বার বলিতেন "রোগের একমাত্র ঔষধ আছে। তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও,

আমি বৃন্দাবনে যাই, সেখানে গেলে আমি সুস্থ হইব।" তাহাতে তাঁহার মাতা আপত্তি করিতেন। কেনই বা না করিবেন? নরু ইহাতে নানারূপ অনুনয় বিনয় করিতেন। কখন বা মাতার নিকট মিনতি করিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিতেন. "মা, আমাকে যদি বৃন্দাবনে না যাইতে দাও, তবে আমি বাঁচিব না।" কিন্তু একথা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা ভাবিতেন, বৃন্দাবনে গেলেই নরু মরিবে, অতএব গৃহে থাকাই তাহার কর্ত্তব্য।

এক দিবস রাজকুমার বলিলেন, মা! যদি আমাকে বৃন্দাবনে না যাইতে দাও, তবে আমি নিশ্চিত পলাইয়া যাইব।" এই কথায় মাতা পিতা চিন্তিত হইলেন। আর রাজ কুমার না পলাইতে পারেন, তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করিলেন। তখন নরোত্তম দেখিলেন যে এরূপ বলিয়া কাজ ভাল করেন নাই। তিনি মনে মনে বিচার করিয়া একটি পরামর্শ স্থির করিলেন। তিনি রাজকুমার, তাঁহার ভোগ সুখের অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি নিতান্ত উদাসীনের ন্যায় বাস করিতেন। তখন পিতা মাতাকে ভুলাইবার নিমিত্ত এ সমুদয় ভাব ছাড়িলেন, আর পাঠে মন দিতে লাগিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীও ঠিক এইরূপ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস মনে মনে বুঝিলেন যে রাজকুমারের প্রেমের অঙ্কুর হইয়াছে। কিন্তু রাজকুমার নিজে উহা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে যে গৌরশিশু তাঁহাকে উন্মত্ত ও বিহ্বল করেন, তিনি শ্রীভগবান কিরূপে হইবেন? কৃষ্ণদাস তাঁহাকে বুঝাইলেন কিন্তু তিনি তাহা বুঝিলেন না। তাঁহার মনে বিশ্বাস যে, তাঁহার হৃদয়ে দ্বাদশবর্ষীয় যে গৌরবর্ণ শিশু বিরাজ করেন, তিনি আর কোন এক জন হইবেন, কিম্বা উহা তাঁহার মনোব্যাধি।

প্রকৃত কথা, তখন রাজকুমার আর স্বাধীন ছিলেন না। অন্ত

কেহ একজন তাঁহার হৃদয়ে পশিয়া তাঁহাকে কাঁদাইত, হাসাইত, নাচাইত, ও যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইত। স্থূলকথা, পূর্ব্বরাগ হইলে যে সমুদায় লক্ষণ হয়, তাহার প্রায় সমুদায় লক্ষণই রাজকুমারের উপস্থিত হইল।

জায়গীরদার, লোক মুখে শুনিয়াছিলেন যে রাজা কৃষ্ণানন্দের এক অতি উত্তম পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। সুতরাং নরোত্তমকে দেখিতে জায়গীরদারের বড় সাধ হইল ও তাঁহাকে লইতে আসোয়ার পাঠাইলেন। জায়গীরদারের আজ্ঞা, কাজেই কৃষ্ণানন্দ পুত্রকে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন; সঙ্গে বহু লোক দিলেন। রাজকুমার মাতা পিতার নিকট কার্ত্তিক মাসে (ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ) বিদায় লইলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে চলিলেন, কিন্তু মনে মনে মাতা পিতার নিকটে জন্মের মত বিদায় লইলেন। গৃহ ছাড়িয়া কিছুদূর গমন করিয়াই রাজকুমার একাকী পলায়ন করিলেন। খেতরিতে শীঘ্র সংবাদ আসিল যে নরোত্তম পলায়ন করিয়াছেন। প্রেম বিলাস হইতে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত হইল :—

"সেই কালে মাতা নরুর সংবাদ পাইয়া।
ঘরের বাহির হয়ে পড়িল আসিয়া॥
অনাথিনী মায়ে নরু ছাড়িল বা কেনে।
না দেখিয়া তোমা বাপু ছাড়িব জীবনে॥
আরে মোর সোণার নরোত্তম গেলা কতি।
আউদড় চুলে কাঁদে হইয়া উন্মতি॥
না জানিল নরু মোর ছাড়ি কোথা গেল।
বিধাতা দারুণ মোরে এত দিনে হৈল॥
সোণার শরীর নরুর কেমনে হাটিবে।
ক্ষুধায় পীড়িত অন্ন কাহারে চাহিবে॥

পলাবার কালে নরু করিলে পিরীতি।
অনাথিনী মায়ে ছাড়ি তুমি গেলা কতি॥

নরোত্তম বৃন্দাবনে পলায়ন করিয়াছেন, সকলে ইহা নিশ্চিত করিলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ নরুকে ধরিবার নিমিত্ত শত শত লোক পাঠাইলেন। এই সমুদয় লোক নানা পথ অন্বেষণ করিয়া চলিল। নরোত্তম শীঘ্রই একদল কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। কেন ধৃত হইলেন তাহা প্রেমবিলাস গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে :—

"আহারের চেষ্টা নাই সকল দিবসে।
ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে॥
পথের চলনে পায় হৈল বড় ব্রণ।
বৃক্ষতলে পড়ি রহে হয়ে অচেতন॥"

রাজকুমার সুখে সচ্ছন্দে থাকিতেন, বয়ঃক্রম আন্দাজ ষোড়শ বৎসর, একে বৃন্দাবনের কঠিন পথ, তাহাতে সম্বলমাত্র নাই, সুতরাং তিনি শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে গৃহে আনিবার নিমিত্ত সেই সৈনিক পুরুষগণ ঘোরতর জিদ করিতে লাগিল, কিন্তু নরুর মন ফিরাইতে কিম্বা তাঁহাকে গৃহে আনিতে পারিল না। যখন সতীদাহ প্রচলিত ছিল, তখন কেহ সহমরণে যাইতে চাহিলে সকলেই প্রথমে তাঁহাকে নিবারণ করিত। এমন কি লক্ষ লক্ষ লোকে, যাহাতে তিনি সতী না হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিত। আবার তাহারাই, সতীর তেজ নিবারণ করিতে না পারিয়া, শেষে আপন হাতেই সতীকে হুতাষণে প্রাণ দিতে সাহায্য করিত। সেইরূপ সাধুর কি সাধ্বীর সংকল্পে বাধা করিতে জীবের সাধ্য নাই।

সেই সৈনিকপুরুষগণ ষোড়শবর্ষীয় রাজকুমারের নিকট পরাস্ত হইল,

তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না। তবে তাহারা এক-কার্য্য করিল, রাজকুমারের সঙ্গে অর্থ সহ এক জন লোক দিল।

রাজকুমার প্রথমে, বারানসীতে শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্থানে কিছু কাল ছিলেন, সেই স্থান দর্শন করিতে গেলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন যে, চন্দ্রশেখরের শিষ্য অতি প্রাচীন বৈষ্ণব সেবাইত এক জন আছেন। কৃষ্ণকথায় সেখানে দুই এক দিবস থাকিয়া প্রয়াগে ও পরে মথুরায় গমন করিলেন। এখনকার তীর্থ দর্শন আর তখনকার তীর্থ দর্শন অনেক প্রভেদ। এখন রেলের গাড়ী চড়িয়া সাত দিনের মধ্যে সমস্ত বড় বড় তীর্থস্থান দর্শন করা যায়।

সুকুমার নৃপতিকুমার পদব্রজে যাইতেছেন, আর মনে মনে প্রভু ও প্রভুভক্তগণকে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার মনে আর কোন ভাব নাই, চিন্তা নাই, কেবল প্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের চিন্তায় দিবানিশি কাটাইতেছেন, বৃক্ষতলায় শয়ন করিতেছেন, আর অমনি প্রভুকে স্বপ্ন দেখিতেছেন ;—কখন দেখিতেছেন স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রতি মৃদু হাস্য করিয়া তাঁহাকে স্নেহ জানাইতেছেন ; কখন দেখিতেছেন, শ্রীনিত্যানন্দ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন ; কখন দেখিতেছেন, রূপ সনাতন তাঁহাকে ক্রোড়ে লইতেছেন।

এইরূপ বিহ্বল অবস্থায় রাজকুমার মথুরায় প্রবেশ করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে মনে করিলেন। সেই ভাবে তাঁহার অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল, আর চলিতে পারেন না, বিশ্রাম ঘাট পর্য্যন্ত যাইয়া সেখানে শয়ন করিয়া পড়িলেন।

যখন ধ্রুব এইরূপে পদ্মপলাশলোচনের অনুসন্ধান করেন, তখন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নারদ ছিলেন। শ্রীভগবান্, এরূপ অবস্থায় স্বয়ং কি অন্য ভক্ত দ্বারা ভক্তগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। নরু ভাবিতেছেন,

তিনি যে বৃন্দাবনে আসিতেছেন কি আসিয়াছেন, ইহা তিনি ও তাঁহার সঙ্গী লোক ভিন্ন আর কেহ জানেন না। কিন্ত তাহা নহে, তাঁহার আগমনের কথা শ্রীবৃন্দাবনে গোপনে ছিল না।

বিশ্রামঘাটে নরু শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীজীবগোস্বামীর লোক আসিয়া তাঁহাকে ডাকিল। শ্রীরূপের অপ্রকটে শ্রীজীব বৃন্দাবনের কর্ত্তা হইয়াছেন। তিনিই বৃন্দাবনের তখনকার সকলের তত্ত্বাবধারক, সকলের আশ্রয়স্থান, এবং সকল তত্ত্বমীমাংসক ছিলেন। শ্রীজীব, রাজ-কুমারের আগমন স্বপ্নে অবগত হইয়া তাঁহাকে খুজিতে বিশ্রামঘাটে লোক পাঠাইলেন। লোক আসিয়া রাজকুমারকে পাইল, ও "শ্রীজীব তোমাকে ডাকিতেছেন" বলিয়া নরোত্তমকে বৃন্দাবনে তাঁহার সমীপে লইয়া চলিল।

রাজকুমার দেখিলেন যে তিনি নিরাশ্রয়ে ভাসিতেছেন না। তিনি বালক, সেই দূরদেশে আছেন বটে, কিন্তু শ্রীভগবান তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি শ্রীজীবের নিকট যাইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তাঁহার পদতলে পড়িলেন। শ্রীজীব আদর করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। যখন লোকনাথ প্রথমে বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন, আর শ্রীজীবের সময়ে অনেক বিভিন্ন। নরোত্তমের বৃন্দাবনে যাইবার আন্দাজ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে লোকনাথ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তিনি আর ভূগর্ভ প্রথমে বৃন্দাবন গমন করেন, আর সেই শ্রীবৃন্দাবন জীবের সময়ে শ্রীগৌ-রাঙ্গের গণে ছাড়িয়া ফেলিয়াছেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ বৃন্দাবন অধিকার করিয়া বহুতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বহুতর বিগ্রহ স্থাপন, লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ প্রচার ও বহু ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীকে শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগত করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া তাহার পাঁচ বৎসর পরে সনাতনকে তথায় পাঠান।

আর শ্রীগৌরাঙ্গ সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার সময় তাঁহাকে ইহাই আদেশ করেন, "সনাতন! তুমি বৃন্দাবনে গমন কর। আমার কান্থা ও করঙ্কধারী ভক্তগণ, যাঁহারা বৃন্দাবনে যান, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিও।" সেই আজ্ঞা সনাতন ও তাঁহার কনিষ্ঠ ও শিষ্য, রূপ পালন করিতেন। আর সেই আজ্ঞা তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবও, তাঁহাদের সঙ্গোপনের পর, পালন করিতেছিলেন। কাজেই অকিঞ্চন, উদাসীন বৈষ্ণব বৃন্দাবনে আসিলে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাদের আশ্রয়দাতা হইতেন।

রাজকুমার শ্রীজীবের আশ্রয়ে রহিলেন, আর গোস্বামী তাঁহাকে যত্ন করিয়া পালন করিতে লাগিলেন। নরু যখন শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েন, তখন তিনি মরণাপন্ন ছাহিল। এইরূপ কয়েক দিন পরে সুস্থ হইলে, নরু শ্রীজীবের অনুমতি লইয়া সাধুদর্শনে বাহির হইলেন। বৃন্দাবনে তখন সাধুর অভাব নাই, আর এক এক জন সাধু ভুবনবিজয়ী ভক্ত। প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের দাসের ভক্ত জগতে কখন কোথাও উদিত হন নাই। নরোত্তম কুঞ্জে কুঞ্জে সাধুদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। এইরূপ শত শত শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত দর্শন করিলেন। এক এক জন এক এক প্রকার তবে সকলেই ভুবনপাবক; সকলেই ঘোর বিরাগী, সকলেই প্রেমে উন্মত্ত। কে বড় কে ছোট, কে বলিবে? নরোত্তম শ্রীলোনাথকেও দেখিলেন, শ্রীলোক-নাথকে দর্শন করিয়াই তাঁহাকে আত্মসমর্পন করিলেন! রাজকুমার যে ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া করিলেন তাহা নয়। তিনি দেখিলেন যে লোক-নাথ যেন তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে জন্মের মত আপনার দাস করিয়াছেন। রাজকুমার জানিলেন যে, লোকনাথই তাঁহার প্রভু। ভজনের আগ্রহে লোকনাথের কাহার সহিত কথা কহিবার অবকাশ ছিল না। যথা অনুরাগবল্লী গ্রন্থে :—

"পরম বিরক্ত কথা নাহি কারু সনে।
যে কহয়ে সে অতি মধুর বচনে॥"

সুতরাং রাজকুমার তাঁহার কাছে কিছু বলিলেন না, মনে মনে তাঁহাকে স্তব করিয়া বলিলেন, "প্রভু! আমি এই দেহ তোমাকে দিলাম। যাহাতে আমি উদ্ধার হই তাহা তুমি করিবে। মনে ভাবুন যে, কোন রমণী কোন যুবককে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, করিয়া পরে জানিতে পারিয়াছেন যে, তিনি যাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার বিবাহ করিবার শক্তি নাই। এরূপ অবস্থার সেই রমণীর যেরূপ দশা হয়, শ্রীলোকনাথকে আত্মসমর্পণ করিয়া নরুর তাহাই রহিল। নরু শ্রীলোকনাথকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া, লোকের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শুনিলেন যে, লোকনাথ কাহাকেও শিষ্য করিবেন না, গোস্বামীর এই দৃঢ় সঙ্কল্প। অনেকে অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহ তাঁহার এই দৃঢ় সঙ্কল্প ভঙ্গ করিতে পারেন নাই। রাজকুমার এ কথা শুনিয়া বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় কাতর হইলেন। তিনি যাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন, তিনি কাহাকেও গ্রহণ করেন না, তবে তাঁহার কি গতি হইবে? এ দেহ তিনি প্রভু লোকনাথকে দান করিয়াছেন, আবার উহা কাহাকে দিবেন? দিবার অধিকারই বা তাঁহার কি আছে? এদিকে প্রভু লোকনাথের সঙ্কল্প ভঙ্গ করে কাহার সাধ্য? যিনি শিশুকালে বৃন্দাবনে আসিয়া ও অরণ্যবাসী হইয়া সমুদয় জীবন শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনে নিয়োগ করিয়াছেন, এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মহাপুরুষ আপন সঙ্কল্প কেন ভঙ্গ করিবেন? তখন রাজকুমার নিরুপায় হইয়া বৃন্দাবনদর্শন-সুখ পরিত্যাগ করিলেন, আর কিছু তাহার ভাল লাগিল না, সর্ব্বদা লোকনাথ তাঁহার অন্তরে বিরাজ করিতে লাগিলেন, কাজেই

তিনি লোকনাথের কুঞ্জের নিকট বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত কথা বলেন এরূপ সাহস হয় না, এমন কি, তাঁহার অগ্রবর্ত্তী হইতেও পারেন না। তবে, দিবারাত্র লোকনাথের কুঞ্জের বাহিরে ক্রন্দন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যথা অনুরাগবল্লী গ্রন্থে:—

"রাত্রিদিনে সেই স্থানে অলক্ষিতে যেয়ে।
বাহিরে টহল করে সাশ্রু নেত্র হয়ে॥"

লোকনাথ ইহার কিছুই জানেন না। তিনি কুঞ্জের মধ্যে ভজনা করিতেছেন, এদিকে রাজকুমার বাহিরে তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহার কুঞ্জের চতুঃপার্শ্বে রোদন করিয়া বেড়াইতেছেন! আবার অলক্ষিতে লোকনাথের সেবাও করিতেছেন। পরে রাজকুমার আর এক নূতন সেবার নিয়ম করিলেন। যথা প্রেমবিলাসে:—

"আর এক সাধন যেই করে নরোত্তম।
রাত্রি শেষে যেই সেবা করিল নিয়ম॥
যেই স্থানে গোসাঞি যায়েন বহির্দ্দেশ।
সেই স্থানে যাই করে সংস্কার বিশেষ॥
মৃত্তিকা শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে।
নিত্য নিত্য এই মতে করেন সেবনে॥
গোসাঞি কহে এমন কার্য্য করে কোন জন।
ইহা নাহি বুঝি করে কিসের কারণ॥
হেন বেলে নরোত্তম করেন সেবন।
সেখানে সে স্থানে কেহ না করে গমন॥
ঝাটা গাছি পুতি রাখে মাটির ভিতরে।
বাহির করি সেবা করে আনন্দ অন্তরে॥

আপনাকে ধন্য মানে শরীর সফল।
প্রভুর চরণপ্রাপ্তি এই মোর বল॥
কহিতে কহিতে কান্দে ঝাটা বুকে দিয়ে।
পাঁচ সাত ধারা বহে মুখ বুক বেয়ে॥
প্রভু লোকনাথ নরোত্তমের জীবন।
বহু জন্ম ভাগ্যে পাই তোমার চরণ॥"

অনুরাগবল্লী গ্রন্থে এই ঘটনা এইরূপে বর্ণিত আছে :—

"মৃত্তিকা শৌচের তরে সুন্দর মাটি আনে।
ছড়া ঝাটী জল আনে বিবিধ বিধানে॥
প্রত্যহ গোসাঞি দেখি হয়েন বিস্মিত।
কোন বা সুকৃতি যার এমন চরিত॥
দেখিবার যত্ন করে দেখিতে না পায়।
তুচ্ছ সেবা দেখি চিত্তে করণা উদয়॥"

লোকনাথ গোস্বামী প্রথমে দু একদিন ইহার কিছু লক্ষ্য করেন নাই। পরে সন্দেহ হইল যে, বুঝি তাহাকে কেহ সেবা করিয়া থাকে। ইহাতে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, আর অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চিত বুঝিলেন যে কোন একজন গোপন করিয়া এরূপ নীচ সেবা করিয়া থাকে। লোকনাথ ইহাতে বড় ব্যথা পাইলেন। এইরূপ সেবায় তিনি নিতান্ত ব্যকুল হইলেন, কিন্তু লজ্জায় কাহাকেও কিছু কহিতে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। যথা প্রেমবিলাসে :—

"লোকেরে কহিতে লজ্জা হয় ত আমার।
কোন ব্রজবাসী আছে হেন কার্য্য যার॥"

তাহার পর মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন যে, এরূপ সেবা আর করিতে

দেওয়া হইবে না। ইহা স্থির করিয়া এক দিবস অতি প্রত্যুষে বহির্দ্দেশে গমন করিলেন, যথা প্রেমবিলাসে :—

"তার পর দিন গোসাঞি চলে বহির্দ্দেশে।
তখন আছয়ে রাত্রি দণ্ড ছয় শেষে॥
হেন কালে সেই স্থানে নরোত্তম আছে।
ঝাটি দিতেছেন গোসাঞি দাড়াইয়া কাছে॥
ঝাটা বুকে নরোত্তম আছেন সাক্ষাতে।
'কে বটে কে বটে বলি লাগিল কহিতে'॥"

অনুরাগবল্লী গ্রন্থ এই ঘটনা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"এই মতে কত দিন সেবন করিতে।
দৈবে একদিন তায় দেখে আচম্বিতে॥
পুছয়ে কে তুমি কেন কর হেন কাজ।
বন্দিয়া নরোত্তম কহে পেয়ে ভয় লাজ॥
কেবল তোমার প্রসন্নতা চাই প্রভু।
এই কৃপা কর মোরে না ছাড়িব কভু'॥"

রাজকুমার এই হাড়ির সেবা এক বৎসর করিতেছেন! এই যে সেবা করিতেছেন ইহাও ভয়ে ভয়ে। মনে ভয় পাছে ধরা পড়েন! আর যে দিন ধরা পড়িলেন, সে দিন অপরাধীর ন্যায় গোস্বামীর চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন!

লোকনাথের হৃদয় দ্রব হইল। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি গৌড়িয়া বটে? কে তুমি বল দেখি? আর আমাকে বা এরূপ সেবা কেন কর?"

তখন নরোত্তম সংক্ষেপে তাঁহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। তিনি রাজা কৃষ্ণানন্দের তনয়। কেমন করিয়া তাঁহার অঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রবেশ করেন, কিরূপে পাগল হইয়া তিনি বৃন্দাবনে আগমন করেন, আর কিরূপে তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া দর্শনমাত্র তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন, এ সমস্ত বলিলেন, "প্রভু, তুমি আমাকে চরণে স্থান না দিলে আমি কোথায় যাইব ?"

তখন লোকনাথ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বাপু! তুমি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপাত্র। তিনি তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, তবে আবার তুমি দীক্ষা কেন চাহিতেছ ? মন্ত্র দীক্ষার যাহা প্রয়োজন, তাহা ত তোমার সিদ্ধ হইয়াছে ?" যথা প্রেমবিলাসে :—

"আপনে হৃদয়ে প্রবেশ করিল তোমার।
তেঁহ জগদ্‌গুরু চাহ গুরু করিবার ?
প্রেম রূপে আপনে চৈতন্য ভগবান।
সেই প্রেম তোমার হৃদয় কৈল দান॥
যে প্রেম লাগিয়া সবে করেন ভোজন।
তোমার অন্তরে সেই বুঝিল কারন॥
প্রয়োজন আছে কিবা গুরু করিবার।
যে সে সাধ্য বস্তু তাহা হৃদয়ে তোমার॥"

ইহাতে রাজকুমার অতি কাতর হইয়া বলিলেন, "প্রভু! আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আমি অতি দীন, আমার মন একান্ত তোমাতে দিয়াছি। তুমি আমাকে অকৃপা করিলে আমার উপায় আর কোথাও হইবে না।"

লোকনাথ বলিলেন, "বাপু! তুমি কাতরোক্তি করিয়া আমাকে কেন ব্যথিত করিতেছ ? আমি সংসার হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইব বলিয়া, কাহাকেও সেবক করিব না, স্থির করিয়াছি। তুমি

আমার সে সঙ্কল্প ভগ্ন করিও না। তোমাকে ও তোমার কার্য্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তুমি আমাকে আবদ্ধ করিও না।"

রাজকুমার বলিলেন, "প্রভু! আমি যখন তোমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমার আর কোথাও যাইবার পথ রাখি নাই। এখন প্রভুর যেরূপ আজ্ঞা তাহাই শিরোধার্য্য।"

শ্রীলোকনাথ অনেক ক্লেশে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, "বাপু! আমার যে কথা তাহা তোমাকে বলিয়াছি। এখন আমার এই কথা তুমি পালন করিবে। তুমি এই হাড়ির সেবা করিয়া আমাকে ব্যথা দিবে না।"

রাজকুমার যে আজ্ঞা বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। লোকনাথ বহির্দ্দেশে গমন করিলেন, রাজকুমার দাঁড়াইয়া রহিলেন। গোসাঞি প্রত্যাগমন করিলে রাজকুমার ভয়ে ভয়ে একটু মৃত্তিকা লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। লোকনাথ তাহা লইলেন। ইহাতে আশ্বস্ত হইলেন। তৎপরে গোসাঞির পশ্চাৎ পাশ্চাৎ তাঁহার কুঞ্জে আসিলেন। গোসাঞি ভজনে বসিলেন, রাজকুমার বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজকুমার প্রত্যহ দুই লক্ষ নাম জপ করেন, আর লোকনাথ গোস্বামীকে নানারূপে সেবা করেন। দুই জনে কোন রূপ বাক্যালাপ নাই। লোকনাথ রাজকুমারকে কিছু করিতে বলেন-না। রাজকুমার গোসাঞির প্রয়োজন বুঝিয়া সেবা করেন। তবে লোকনাথ এই কৃপা করেন যে রাজকুমারকে তাহার সেবা করিতে নিষেধ করেন না।

এইরূপে আর এক বৎসর গেল। পরস্পরে কোন আলাপ হইল না। একদিন শ্রাবণ মাসে লোকনাথ নরোত্তমকে কাছে ডাকিলেন। রাজকুমার ইহাতে ব্যস্ত হইয়া করযোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রভু

ডাকিয়াছেন, যদিও অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে, কিন্তু আবার ভয়ও হইয়াছে। লোকনাথ বলিলেন, "বাপু তোমার কথায় আমার সঙ্কল্প সিথিল হইয়া গিয়াছে। তুমি ওটি দুই প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবে?"

রাজকুমার। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

লোকনাথ। প্রথম, মৎস্যাদি ভক্ষণ করিবে না। দ্বিতীয়তঃ বিষয়-স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

রাজকুমার। যে আজ্ঞা।

লোকনাথ। ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে, দারপরিগ্রহ করিতে পারিবে না। নরোত্তম! বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবে। ইন্দ্রিয়কে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে।

রাজকুমার। আপনার কৃপা পাইলে আমি সব করিতে পারি। আমি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পূর্ব্বেই লইয়াছি; আর অদ্য আপনার আজ্ঞায় সেই প্রতিজ্ঞা বদ্ধমূল হইল।

লোকনাথ। বাপু! তোমারি জয় হইল। তোমার সংকল্পে আমার সংকল্প নষ্ট হইয়া গেল। এস বাপু! তোমাকে আলিঙ্গন দেই।

রাজকুমারের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তাঁহার ব্রত সফল হইল। তাঁহার শুষ্ক জীবনলতা পুনর্জ্জীবিত হইল। তিনি তখন বাহু প্রসারিয়া লোকনাথ গোস্বামীর চরণ দুটি ধরিয়া বলিলেন, "প্রভো! তুমি দয়াময়, তাহাই জানিয়া আমার চিত্ত তোমাতে গিয়াছিল।" তখন লোকনাথ রাজকুমারকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দিলেন, এবং গুরু শিষ্যের গলা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। লোকনাথ বলিলেন, "তুমি আমার আদি, মধ্যম ও শেষ সেবক। তোমার ন্যায় শিষ্য জগতে দুর্লভ। এরূপ শিষ্য পরম ভাগ্যে মিলিয়া থাকে। আমি এরূপ ভাগ্য কেন ত্যাগ করিব?"

শ্রাবণের পূর্ণিমাতে রাজকুমারকে মন্ত্র দিবেন এই কথা সাব্যস্ত করিলেন। সেই দিন প্রত্যূষে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবনের মহান্তগণ লোকনাথের কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের নাম করিলে মন নির্ম্মল হয়। সেখানে আচার্য্য প্রভুও উপস্থিত হইলেন। লোকনাথ রাজকুমারকে লইয়া যমুনায় স্নান করাইলেন ও কুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে আপনার পদ ধৌত করিয়া দিতে কহিলেন। পদ প্রক্ষালন করা হইলে লোকনাথ আসনে বসিলেন। পরে তিনি শ্রীভগবানকে স্তব করিতে লাগিলেন, আর রাজকুমারের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া শত শত বার ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। গুরু হওয়া সোজা কথা নয়।

স্তব সমাপ্ত হইলে, রাজকুমারকে বামে বসিতে বলিলেন। রাজকুমার বসিলে, লোকনাথ বলিলেন, "বাপু! এখন তুমি আমাকে আত্ম সমর্পণ কর, আর তোমার শরীরে যত পাপ আছে আমাকে দাও।" আবার বলি গুরু হওয়া বড় কঠিন বিষয়। শিষ্যের পাপ লইতে হয়। নরোত্তম গোস্বামীর চরণ দুটি ধরিয়া একান্ত মনে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। তখন গোস্বামী বলিলেন যে, তিনি নিজে মঞ্জুনালী আর রাজকুমার বিলাস-মঞ্জুরী। শেষে তিনি ক্রমে ক্রমে ভজন সাধন প্রণালী একে একে রাজকুমারকে বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর লোকনাথ বলিলেন, "তুমি এখন আগন্তুক সাধু বৈষ্ণবগণকে প্রণাম কর।"

নরোত্তমের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে লেপিত, গলায় ফুলের মালা, প্রেমানন্দে বদন প্রফুল্ল, এবং উহা দিয়া আনন্দ ধারা বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে। রাজকুমার বাহিরে আসিয়া জীব গোস্বামী প্রভৃতি মহান্তগণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সকলে তাঁহার রূপ ও তেজ দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুকালাপরে জীব গোস্বামী রাজকুমারকে "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি দিয়াছিলেন। এখান হইতে রাজকুমারের কাছে আমরা বিদায় লইলাম। এখন আর নরোত্তম রাজকুমার রহিলেন না, কারণ এখন তিনি নিষ্কিঞ্চন ব্রহ্মচারী হইলেন। এই অবধি তাঁহাকে আমরা "নরোত্তম ঠাকুর" মহাশয় বলিব।

আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয়।

—❋—

ইহার পূর্ব্বে লোকনাথ গোস্বামীর কুঞ্জে ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আচার্য্য প্রভুর মিলন হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কথা এখানে অধিক বলিতে পারি না। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র বর্ণিত আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ যে কেন নিজ সঙ্গ ছাড়াইয়া লোকনাথকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার কতক কারণ এখন—এই শ্রীনরোত্তমকে কৃপায়—বুঝা গেল। তিনি প্রেমমুগ্ধ ও ভক্তিবিগলিত এই ব্রাহ্মণ কুমারটিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। এই ব্রাহ্মণকুমার আন্দাজ ত্রিশ বৎসর সাধন ভজন করিলেন, করিয়া প্রেমধন অর্জ্জন করিলেন। পরে নরোত্তমকে সৃষ্টি করিয়া প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া গেলেন। সেখানে লোকনাথ ত্রিশ বৎসরের অর্জ্জিত পরম প্রেমধন এক নরোত্তমকে সমুদায় দান করিলেন। নরোত্তম এই ধন লইয়া কি করিলেন, তাহা এই পুস্তক পড়িলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গোপন হইলে তাঁহাদের শক্তি লইয়া আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ বঙ্গদেশে ভক্তি প্রচার করেন। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শ্রীআচার্য্য প্রভুতে শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তি ছিল। শ্রীনিবাসাচার্য্যও ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের বর পুত্র। উনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রীনিবাস নীলাচল যাইবার সময় পথে তাঁহার অপ্রকট বার্ত্তা শুনিলেন। শুনিয়া সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে নানা দুঃখ পাইয়া তিনি একপুত্রা জননীর নিকট বিদায় লইয়া ঠাকুর মহাশয়ের আসিবার পূর্ব্বে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয়ের কিছু বড়। উভয়ের নূতন যৌবন ও অনুপম সৌন্দর্য্য, আর তাঁহাদের প্রেমের কথা ইহা বলিলেই হইবে যে উভয়েই শ্রীগৌরাঙ্গের বরপুত্র। শ্রীজীব গোস্বামীর নিকটে উভয়ে ভক্তি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

এখানে ভক্তি গ্রন্থের তাৎপর্য্য বলিতে হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কোন গ্রন্থ লিখেন নাই, তবে তিনি কি ধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহা লিপি-বদ্ধ করিবার নিমিত্ত ছয় জন ভক্ত আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা গোস্বামী বলিয়া পরিচিত। যাহাতে তাঁহারা এ কার্য্যে ক্ষমবান হয়েন, শ্রীভগবান্ গৌরাঙ্গ এই নিমিত্ত এই ছয় গোস্বামীকে শক্তি সঞ্চার করেন। বৃন্দাবনে এই গোস্বামীগণ যে সমুদায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সাধারণতঃ তাহাদিগকে ভক্তি গ্রন্থ বলে।

এইরূপ সহস্র সহস্র গ্রন্থ বৃন্দাবনে প্রণীত হইল। কিন্তু সে সমুদায় গ্রন্থ বৃন্দাবনেই থাকিল, গৌড়ের কোন লোকে তাহা দ্বারা উপকৃত হইলেন না। গোস্বামিগণ এই সমস্ত গ্রন্থ নকল করিয়া অনায়াসে বঙ্গে প্রচার করিতে পারিতেন, কিন্তু তখন সে পুস্তকের মর্ম্ম বুঝাইবার লোক ছিল না।

গোস্বামিগণের মধ্যে কাহারও বৃন্দাবন ত্যাগ করিবার অধিকার ছিল না। সুতরাং ভক্তি গ্রন্থ সমুদয় বৃন্দাবনেই রহিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণ বৃন্দাবনে গমন না করিলে আর তাহার আস্বাদন করিতে পারিতেন না। গৌড়ে এই গ্রন্থ প্রচার করিবার নিমিত্ত প্রধানতঃ শ্রীনিবাস সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ, এই তিন জনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তি গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা কৃতবিদ্য হইলে গৌড়ে আসিবেন, আসিয়া ভক্তি গ্রন্থ পড়াইবেন। তিন জনের পাঠ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহা-

দিগের প্রত্যেককে এক একটী আখ্যা দিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নরোত্তম "ঠাকুর মহাশয়" আখ্যা পাইলেন। শ্রীনিবাসের আখ্যা হইল "আচার্য্য প্রভু" আর দুঃখী কৃষ্ণদাসের নাম হইল "শ্যামানন্দ।"

পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীজীব গোস্বামী সাব্যস্ত করিলেন যে, এই তিন জনকে গৌড়ে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিতে পাঠাইবেন। এই নিমিত্ত মহান্তগণের কাহার কিরূপ অভিপ্রায়, জানিবার কারণ শ্রীজীব অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। রাস সম্মুখে দেখিয়া তিনি অগ্রে এ কথা কাহারও নিকট কিছু না বলিয়া সেই উৎসব উপলক্ষে সমস্ত মহান্তগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যাহারা দূরে বাস করেন, তাঁহারা দ্বাদশী দিবসে উপস্থিত হইলেন। রাসের দুই তিন দিবস পূর্ব্ব হইতে মহোৎসব আরম্ভ হইল। মথুরাবাসী মহাজনগণ ও আগরাবাসিগণ ভারে ভারে মহোৎসবের সামগ্রী উপস্থিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীজীবের কুঞ্জ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ ভূমি হইল। সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ সকলে উপস্থিত। এই মহোৎসবে যে যে মহান্ত আসিবেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম লিখিয়া পবিত্র হইব। গোস্বামী লোকনাথ ও ভূগর্ভ আসিলেন, ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের সঙ্গে। আচার্য্য প্রভুকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামী গোপাল ভট্ট আসিলেন। রাধা-কুণ্ড তীর হইতে রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আসিলেন। মধুপণ্ডিত, প্রেমী কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, হরিদাসাচার্য্য, রাঘব পণ্ডিত, যাদবাচার্য্য পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, উদ্ধব, গোবিন্দ, মাধব প্রভৃতি ভুবন পাবক সাধকগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, গৌরলীলাকথন প্রভৃতি আনন্দে দিবারাত্রি সকলে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অগ্রে শ্রীগোবিন্দের ও শ্রীগৌরাঙ্গের ভোগ দেওয়া হইল। পরে শ্রীনিতাই ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুদ্বয়ের এবং তার পরে স্বরূপ,

রাম রায় প্রভৃতি ও রূপ সনাতনের ভোগ দেওয়া হইল। বৈষ্ণবগণ, কৃষ্ণ-কথায়, প্রেম ও সুখের সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, গ্রহণ করিয়া সমস্ত কুঞ্জ শোভা করিয়া উপবেশন করিলেন।

তখন শ্রীজীব করযোড়ে মহান্তগণকে নিবেদন করিতেছেন, "প্রভুর প্রিয়স্থান গৌড় মণ্ডল, যেখানে ভক্তি প্রচার হইল না এ বিষয়ে প্রভুগণের কিরূপ আদেশ আছে, তাহা আপনারা জানেন। এই শ্রীনিবাস প্রভু, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ, ইহাদিগকে আমি ভক্তি গ্রন্থ সম্বলিত গৌড়ে ভক্তি প্রচার করিতে পাঠাইতে বাসনা করিয়াছি। ইহাতে আপনাদের অনুমতি ও কৃপা প্রার্থনা করি।" আবার বলিতেছেন, "শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীভট্ট গোস্বামীর সেবক এবং ঠাকুর মহাশয় শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সেবক, তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত ইহারা যাইতে পারেন না। যদি ইহারা কৃপা করিয়া তাঁহাদের অসীম অধিকারী ও কৃপাপাত্র এই দুই জনকে গৌড়ে যাইতে অনুমতি করেন ও শক্তি সঞ্চার করেন, তবে গৌড়ে ভক্তি গ্রন্থ প্রচার হইতে পারে।"

তখন সকল মহান্ত "সাধু সাধু" বলিলেন। লোকনাথ গোস্বামী ও ভট্ট গোস্বামী শিষ্য স্নেহে কাতর হইলেন, কিন্তু তবু তাঁহারা মনের সহিত সম্মতি দিলেন। অমনি ইহারা দুই জনে দুই প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন (যথা প্রেমবিলাসে):—

"আচার্য্য ঠাকুর আর ঠাকুর মহাশয়।
দণ্ডবৎ করি কহে করিয়া বিনয়॥
যদি আজ্ঞা হয় প্রভু রহি বৃন্দাবনে।
প্রভুর চরণ সেবা করি রাত্রি দিনে॥"

তাহাতে গোস্বামিগণ কহিলেন:—

"বড় ধর্ম্ম হয় বাপু ধর্ম্ম প্রচারণ।
সভার আজ্ঞায় গৌড়ে করহ গমন॥'

তখন জীব গোস্বামী বলিলেন, "আপনারা ইঁহাদিগকে কৃপা করুন। ইঁহাদিগকে এরূপ শক্তি প্রদান করুন যে, ইঁহারা জীবকে ভক্তি দান ও তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন।" তখন আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ, সমুদয় মহান্তগণকে জনে জনে প্রণাম করিলেন ও তাঁহাদের শ্রীচরণ-রেণু শিরে লইলেন, আর মহান্তগণ তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যে শিক্ষা দিলেন, তাহা বৃন্দাবনে গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইল, এখন সেই শিক্ষা গৌড়ে আসিতেছেন। গৌড়ে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, উহা প্রায়ই প্রভুর লীলা সংঘটিত। যথা, অনন্ত সংহিতা, মুরারীর কড়চা, চৈতন্য ভাগবৎ, কবি কর্ণপুরের গ্রন্থাবলী, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি। কৃষ্ণদাসের চরিতামৃতও বৃন্দাবনে লিখিত হয় আর এই তিন জনে উহা এ দেশে লইয়া আইসেন।

তাঁহার পর শ্রীজীব গোস্বামী, তাঁহার সেবক, কোন এক মথুরাবাসী ধনবান মহাজনকে ডাকাইলেন। সেই মহাজন আসিলে তাঁহাকে বলিলেন যে, তিন জন ভক্ত সমুদয় ভক্তিগ্রন্থ লইয়া গৌড় দেশে যাইবেন তাহার সমুদয় সজ্জা তাহাকে করিয়া দিতে হইবে। গ্রন্থ রাখিবার নিমিত্ত বড় সম্পুট চাহি। আর সেই সম্পুট আবরণ রাখিবার নিমিত্ত উত্তম সূক্ষ্ম মোমজামা প্রয়োজন হইবে। একখানা গাড়ীতে এই গ্রন্থ-সম্পুট যাইবে। গাড়ীর নিমিত্ত চারিটী বলিষ্ঠ বলদের প্রয়োজন, এই গাড়ী রক্ষার নিমিত্ত দশ জন অস্ত্রধারী সৈনিক লাগিবে। এই আজ্ঞা পাইয়া, দশ দিবসের করার করিয়া, সেই মহাজন কৃতার্থমন্য হইয়া গোস্বামীর নিকট বিদায় লইলেন।

কয়েক দিবস পরে সিন্দুক আসিলে, তাহাতে স্তরে স্তরে গ্রন্থ সাজান হইল। বৃন্দাবনে যে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল সমুদয় তাহাতে রাখা

হইল। এইরূপে ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, ভগবতামৃত, সনাতন গীতা, হরিভক্তি বিলাস, দাস গোস্বামীর গ্রন্থ, ষট্ সন্দর্ভ ইত্যাদি গ্রন্থ গৌড়দেশে আসিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতও আসিল।

ইহার মধ্যে শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের কথা আপামর সাধারণ সকলেই জানেন। এই গ্রন্থরত্ন শ্রীকবিরাজ গোস্বামী রাধাকুণ্ডের তীরে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সাহায্যে প্রণয়ণ করেন। মুরারী গুপ্তের কড়চা, স্বরূপের কড়চা, রূপ গোস্বামীর অষ্টক, চন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া চরিতামৃত লেখা হয়। কিন্তু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, কবিরাজ গোস্বামীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত একত্র বাস করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করেন। সুতরাং প্রভুর নীলাচলের লীলা সমুদায় পরিস্কার রূপে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। একটী প্রবাদ আছে যে জীবগোস্বামী, এই চরিতামৃত গ্রন্থখানি ভাষায় লিখিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া গৌড়ে পাঠাইতে আপত্তি করেন। কিন্তু কোন গ্রন্থে এরূপ হাস্যকর প্রবাদের কথা উল্লেখ নাই।

ক্রমে বৃন্দাবন পরিত্যাগের সময় হইল। আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয় স্ব স্ব গুরুর নিকট বিদায় লইতে গেলেন। ভট্ট গোসাঞি আচার্য্য প্রভুকে নানামত প্রবোধ করিলেন। আর আজ্ঞা করিলেন, "বাপু! আর একবার বৃন্দাবনে আসিয়া আমাকে দেখা দিবা।"

ঠাকুর মহাশয় লোকনাথ গোস্বামীর কাছে বিদায় হইতে গেলে গোসাঞি বলিলেন, "নরোত্তম! তুমি কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহাতে তোমার বিষয়ের মধ্যে বাস করিতে হইবে। বিষয়ে বাস করিয়া কর্ত্তব্য পালন করা তোমার ক্লেশ হইবে। সে যাহা হউক,

তোমার পদস্খলন কখনই হইবে না। দিবানিশি ভজনানন্দে থাকিবে, জীবগণকে উদ্ধার করিবে, তোমার বৃন্দাবনে পুনরায় আসিবার প্রয়োজন নাই। তুমি সেখানে থাকিয়া জীবের মঙ্গল করিবে।" এই কথা শুনিয়া ঠাকুর মহাশয় গুরুর চরণে পড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন। আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না।

লোকনাথ গোস্বামীর ধৈর্য্য অন্তর্হিত হইল। তিনি নরোত্তমকে হৃদয়ে করিলেন, করিয়া গদ গদ হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার আদি, মধ্য ও শেষ শিষ্য। আমার কাহাকেও শিষ্য করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু করি কি, প্রভুর ইচ্ছা আমি কিরূপে লঙ্ঘন করিব? এই শেষকালে তোমার স্নেহে আবদ্ধ হইয়া, তোমার বিরহ জনিত দুঃখ হইতেছে। তুমি আমাকে যেরূপ সেবা করিয়াছ, ইহা জগতে আদর্শস্থল হইল। এ জনমে আর আমাকে কেহ সেবা করিবে না। এই জনমে তোমার আমার এই শেষ দেখা।"

নরোত্তম এই কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গোসাঞি তখন প্রিয় শিষ্যের সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। এখন কোথায় বা এরূপ গুরু, আর কোথায় বা এরূপ শিষ্য!

প্রভু লোকনাথ, ঠাকুর মহাশয়ের নিকট এক কপর্দ্দকও লয়েন নাই। এখন আচার্য্যগণ ক্ষোভ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, শিষ্যে আর গুরুর সম্মান বুঝে না। কিন্তু শিষ্য যদি গুরুর লোভের বস্তু হইল, তবে তাঁহারা আবার ভক্তির লোভ করেন কেন? শিষ্যের নিকট ভক্তি প্রার্থনা কর, অর্থ লইও না। অর্থ লইতে লোভ হয়, তবে শিষ্যের ভক্তির প্রার্থনা করিও না। শিষ্য দুই বস্তু দিতে পারে না।

যখন লোকনাথ পূজা ও ধ্যান করিতেন, তখন নরোত্তম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার সেবা করিতেন। গ্রীষ্মকালে বায়ু ব্যাজন করিতেন,

শীতকালে কাষ্ঠের অগ্নি করিতেন, গৃহদ্বার পরিষ্কার করিতেন, কুসুম চয়ন করিতেন, জল আনিতেন, বহির্বাস কৌপীন বহিতেন, আর গোসাঞি দুই এক দণ্ড নিদ্রা গেলে তাঁহার পদসেবা করিতেন।

উপবাসে ও দিবানিশি কঠোর তপস্থায় গোসাঞির ক্লিষ্ট দেহ। নরোত্তমের ন্যায় একজন প্রিয় স্নিগ্ধ সঙ্গী পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে নব স্নেহের উদ্রেক হইয়াছিল। এই কঠোর তপস্থার মধ্যে নরোত্তম তাঁহার একমাত্র সংসারসুখ ছিলেন। নরোত্তম চেতন পাইলে গোসাঞি বলিতেছেন, "নরোত্তম! প্রভু আমাকে এই আজ্ঞা করিয়া বৃন্দাবন প্রেরণ করেন যে, 'লোকনাথ! তুমি ও আমি সুখ ভোগের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করি নাই।' সে কথা আমার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তুমি ত প্রভুর বরপুত্র, তুমিও সুখ ভোগ করিতে আইস নাই। তবে নরোত্তম আমাকে ভুলিও না।"

লোকনাথ প্রভুর সহিত ঠাকুর মহাশয়ের এই শেষ দেখা। লোকনাথ গোস্বামীর যে কার্য্য তাহা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চির জীবনের অর্জ্জিত সমস্ত শক্তি নরোত্তমকে অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

শ্রীগোবিন্দ দেবের মন্দিরে সকলে একত্র হইলেন। অনেক মহান্তও আসিলেন। মোমজামা মণ্ডিত সিন্ধুক গাড়ীতে উঠান হইল। গোবিন্দ দেবের প্রাঙ্গণে সকলে দণ্ডবৎ করিয়া পড়িলেন। শ্রীজীব, গোবিন্দ দেবের মুখপানে চাহিয়া তাঁহার চরণে সমস্ত গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া দিলেন। পূজরী প্রসাদী মালা আনিয়া দিলেন। শ্রীজীব সেই মালা আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দকে পরাইলেন। শ্রীজীব গোস্বামী, শ্যামানন্দকে ঠাকুর মহাশয়ের হাতে সঁপিয়া দিলেন। তখন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" রবের মধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তিনজনে রোদন করিতে করিতে চলিলেন।

শ্রীজীব কতক দূর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তিনি তখন আপনাকে কৃতার্থমন্য ভাবিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচার করার ভার প্রধানতঃ তাঁহার বংশের উপর শ্রীগৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক অর্পিত হয়। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গোস্বামী সনাতন অদর্শন হইয়াছেন। তাহার পর তাঁহার আর এক জ্যেষ্ঠতাত ও গুরু শ্রীরূপ গোস্বামী অদর্শন হইয়াছেন।

শ্রীজীবের স্কন্ধে তাঁহাদের উভয়ের বৃহৎ ভার পড়িয়াছে। এই ভার ফুলাইবার নিমিত্ত অগ্রে শ্রীজীব, অতি যত্ন সহকারে এই তিনজনকে ভক্তি গ্রন্থ পড়াইলেন। শ্রীজীব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, ভারতবর্ষে তাঁহার তুল্য পণ্ডিত কেহ ছিলেন না। কিন্তু গৌড়দেশও পণ্ডিতের স্থান। এই গৌড়দেশে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিতে হইলে পদে পদে ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ কলহ করিবেন ও নানারূপ বাধা দিবেন। তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন এরূপ ক্ষমতাশালী পণ্ডিত ব্যতীত গৌড়ে ভক্তিগ্রন্থ প্রচলন করা হইবে না। এই তিন ভক্ত এই বৃহৎ কার্য্যের সম্যক উপযোগী হইলেন। ইহাদের হস্তে গৌড়ে ভক্তিগ্রন্থ প্রেরণ করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন কি, তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়া হইতে না পারিয়া মথুরা পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং চলিলেন।

গোস্বামী মথুরা হইতে বৃন্দাবনে ফিরিলেন। গাড়োয়ান দুই জন চারিটি বলদ লইয়া গাড়ি চালাইল। অস্ত্রধারী দশজন গাড়ি ঘিরিয়া চলিল, আর আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ কৃষ্ণ কথা রসে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মথুরার মহাজন রাজপত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া তাঁহারা স্বচ্ছন্দে রাজপথে চলিলেন। বহুদূর আসিয়া বন পথে আসিতে ইচ্ছা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ বন পথে গমনাগমন করেন, সেই কথা মনে করিয়া তাঁহারা রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া বন

পথে প্রবেশ করিলেন। বন পথে, দুই এক দিন, কখন কখন তাহা অপেক্ষা অধিক দিন, লোকালয় দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু সঙ্গে গাড়ী ছিল, তাহাতে আহারীয় চলিত। তাঁহারা পনর জন লোক, তাহার মধ্যে দশজন অস্ত্রধারী, এই নিমিত্ত স্বচ্ছন্দে অকুতোভয়ে চলিলেন। নূতন নূতন পক্ষী ও ময়ূরের নৃত্য দর্শন, কোকিল পাপিয়া প্রভৃতির গীত শ্রবণ, নিঝরে স্নান, বনে ভোজন, কুশ শয্যায় শয়ন প্রভৃতি সুখভোগ করিতে করিতে সকলে দেশাভিমুখে চলিলেন। এই-রূপে পঞ্চকোট পর্য্যন্ত আসিলেন।

যাহাকে এখন বনবিষ্ণুপুর বলে, সেখানে পূর্ব্বে এক স্বাধীন রাজার রাজধানী ছিল। এখানে রাজপুতদিগের মল্ল-বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন। বিষ্ণুপুরের বর্ণনা করিয়া একজন ফরাসী পরিব্রাজক বলিয়াছেন যে, এরূপ সুশাসিত দেশ ভূমণ্ডলে নাই। রাজগণও প্রভূত ক্ষমতাশালী ছিলেন, মুসলমানগণ তাঁহাদের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। রাজাদিগের বড় বড় কামান ছিল, আর এরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, শত্রু আসিলে তাঁহারা দেশ জলে প্লাবিত করিতে পারিতেন। সেই বৃহৎ কামান গুলির মধ্যে অদ্যাপি একটী সেখানে আছে। লোকে বলে যে, এরূপ বৃহৎ কামান জগতে আর নাই। ভক্তগণ গ্রন্থ লইয়া এই বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইলেন। প্রেমবিলাসে :—

"পঞ্চকোট বামে রাখি রঘুনাথপুর।
নিজ দেশ বলি বাড়ে আনন্দ প্রচুর॥
মালিয়াড়া গ্রামেতে ভৌমিক একজন।
স্বচ্ছন্দে রহিল তথা আনন্দিত মন॥"

গোপালপুরের নিকটে মালিয়াড়া গ্রামে একজন ভৌমিকের বাড়ীতে তাঁহারা রজনী বাস করিতেন। গোপালপুর পঞ্চকোট হইতে ১০।১২

ক্রোশ দূরে। রাত্রি অধিক হইয়াছে, সকলে নিদ্রিত, এমন সময় বহু সমারোহ করিয়া নিকস্থ গোপালপুর হইতে এক দল ডাকাইত আসিল। তাহাদের দলে অনেক লোক ও সঙ্গে বন্দুক ছিল, তাহারা বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। সুতরাং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে দশ জন অস্ত্রধারী সাহসী হইল না। ডাকাইতগণ কাহারও গাত্র স্পর্শ করিল না, গ্রন্থের গাড়ীখানি টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল!

ডাকাইতগণ চলিয়া গেলে, সকলে দেখিলেন যে, তাহারা গাড়ী লইয়া গিয়াছে। ইহাতে তিন জনে ভূমিতলে পড়িলেন, রোদন করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল, তাঁহারা স্তব্ধ হইয়া সারা রাত্রি কাটাইলেন। প্রভাতে একটু চৈতন্য হইল, তখন তাঁহারা গাড়ীর পথ অনুসন্ধান করিতে গেলেন। কিন্তু পাহাড়িয়া দেশ, গাড়ীর চাকার কিছুমাত্র নিদর্শন পাইলেন না। ইহাতে তিন জনে হতাশ হইয়া বসিলেন। আচার্য্য প্রভু বলিলেন, "তোমরা দুই জনে দেশে চলিয়া যাও. আমি গাড়ীর অনুসন্ধান করি।" ইহাতে ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাতে আচার্য্য প্রভু বলিলেন, "তোমাদের উপর জীব উদ্ধার ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ভার। আর ঠাকুর মহাশয়! তোমার হস্তে শ্যামানন্দকে দিয়া শ্রীজীব গোস্বামী আজ্ঞা করিয়াছেন যে, দুই জন লোক দিয়া উহাকে উঁহার দেশে (উৎকলে) পাঠাইবে। তোমাদের কার্য্য তোমরা কর। শ্রীজীব গোস্বামী গ্রন্থ প্রচারের ভার আমার উপর দিয়াছেন। গ্রন্থ চুরি আমার অপরাধ হইয়াছে। যদি আমার অপরাধ ভঞ্জন হয়, তবে গ্রন্থ উদ্ধার করিব। তোমাদের কার্য্য তোমরা কর, আমার কার্য্য আমি করি।" বস্তুতঃ গ্রন্থ প্রচারের ভার প্রধানতঃ আচার্য্য প্রভুর উপর ছিল, যেহেতু তিনি তিন জনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত।

আচার্য্য প্রভু অনেক গ্রাম তল্লাস করিয়া কাগজ কলম সংগ্রহ করিলেন ও শ্রীজীব গোস্বামীকে সমুদয় বিবরণ লিখিয়া ব্রজবাসীদের হস্তে পত্র দিলেন। আচার্য্য প্রভু আরও লিখিলেন যে, "আপনাদের আজ্ঞা অনুসারে ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ খেতরি যাইতেছেন। আমি গ্রন্থ অনুসন্ধান না করিয়া এ স্থান ত্যাগ করিব না।"

ঠাকুর মহাশয় আচার্য্য প্রভুকে বলিলেন, "তোমার আজ্ঞা আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না। কিন্তু এই-বনে তোমাকে একা ফেলিয়া যাইব ইহা কিরূপে হইতে পারে?"

ইহাতে আচার্য্য প্রভু উত্তর করিলেন, "বিষ্ণুপুর গ্রাম ইহার নিকটে। আমি রাজার সাহায্য লইয়া গ্রন্থের অনুসন্ধান করিব। আর এক কথা বিবেচনা করিতে হইবে যে, যে দস্যু গাড়ী লইয়া গিয়াছে, সে ধন লোভে এই কার্য্য করিয়াছে। গ্রন্থ সে রাখিবে কেন? অবশ্য তল্লাশ করিলে সে গাড়ী পাওয়া যাইবে।" ঠাকুর মহাশয় আচার্য্য প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। আচার্য্য প্রভুকে তিনি গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন বৈষ্ণব মতে বিধি নাই। ঠাকুর মহাশয়ের যদিও আচার্য্য প্রভুকে একাকী রাখিয়া যাইতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিষ্ণুপুরে রাখিয়া, তিনি ও শ্যামনন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে দেশাভিমুখে চলিলেন।

ঠাকুর মহাশয় কি অবস্থায় চলিলেন, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যথা প্রেমবিলাসে:—

"প্রাতঃকালে দুই জনে করিল বিদায়।
কে কহিবে কত দুঃখ উঠিল হিয়ায়॥
করে ধরি কহে শুন ওহে নরোত্তম।
না পাইলে গ্রন্থ সব ছাড়িব জীবন॥

কান্দিয়া কান্দিয়া দোঁহে হইল বিদায়।
ইহদেশে যান তেঁহ কান্দিয়া বেড়ায় ॥
ঠাকুর মহাশয় দুঃখিত অন্তর বাহিরে।
না জানয়ে কোথা থাকে যায় কোথাকারে ॥"

এমন দুর্ঘটনা কেন হইল? ভগবান কেন এরূপ দণ্ড করিলেন? গোস্বামীগণ যে ভার দিলেন, তাহা পালন করা হইল না। ইহা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ। তিন জনে গ্রহরূপ মহানিধি বুকে করিয়া লইয়া আসিতেছেন, কেন না জীবকে ভক্তি শিক্ষা দিবেন বলিয়া। এই গ্রন্থ চুরি গিয়াছে,—কোথা, না বিদেশে জঙ্গলের মধ্যে। আচার্য্য প্রভুকে বিষ্ণুপুরে রাখিয়া আমরা ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দকে গৌড়দেশে লইয়া চলিলাম। ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ অচেতনবৎ সমস্ত পথ রোদন করিতে করিতে গৃহমুখে চলিলেন, এবং কয়েক দিবস পরে পদ্মাবতী তীরে উপস্থিত হইলেন।

ও-পারে খেতরি। তখন ঠাকুর মহাশয়ের মাতা পিতার কথা মনে পড়িল। তাঁহারা কি জীবিত আছেন? মাতা পিতার স্নেহের কথা মনে হইতে লাগিল ও নরোত্তম খেতরি পানে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নদী পার হইলেন ও নিজ ঘাটে উঠিলেন,—যে ঘাটে প্রেমের বীজ পাইয়াছিলেন। লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কৃষ্ণানন্দ ও তাঁহার রাণী কি জীবিত আছেন?" তাহারা বলিল, "জীবিত আছেন বটে, তবে পুত্রশোকে তাঁহারা জীবন্তে মরা হইয়া আছেন। তখন শ্যামানন্দ বলিলেন তোমরা তাঁহাদিগকে সংবাদ দাও যে তাঁহাদের পুত্র গৃহে আসিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া সকলে দৌড়িয়া সংবাদ দিতে গেল। রাজা শুনিবা মাত্র অমনি বাইরে আসিলেন। রাণীও

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। বাহির হইয়া দেখেন, দ্বারের নিকটে দুইটী উদাসীন যুবক দাঁড়াইয়া।

ঠাকুর মহাশয়ের পরিধান কৌপিন ও বহির্ব্বাস, সঙ্গে হরিনামের মালা ব্যতীত আর কোন সম্বল নাই। পথক্লেশে, উপবাসে, ও মনের দুঃখে, বদন ও দেহ শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে। মাতা পিতা ঠাকুর মহাশয়ের দশা দেখিয়া সুখে দুঃখে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। নরোত্তম তখন তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিলেন। ইহাতে তাঁহারা ভয় পাইলেন, যেহেতু পুত্রকে দেখিয়া তাঁহাদের বাৎসল্যের স্থানে ভক্তির উদয় হইয়াছে। ক্রমে পাত্র মিত্র প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ ও গ্রামস্থ সকল লোক আসিয়া ঠাকুর মহাশয়ের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

কিন্তু ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে গ্রন্থ চুরিরূপ জলন্ত আগুণে জলিতেছে। এমন কি, তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতার সমাগমেও সুখ ভোগ করিতে পারিতেছেন না। কেবল মাঝে মাঝে "হরিবোল, হরিবোল," বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছেন।

পিতা মাতা পুত্রকে লইয়া আবার সংসার করিবেন, ইহাই তাঁহাদের মনের বাসনা, কিন্তু পুত্রের ঘোর বৈরাগ্য দেখিয়া কিছু বলিতে সাহস হইতেছে না। জননী তাঁহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাইতে চাহিলেন, তাহাতে নরোত্তম কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন যে, পিতা মাতাকে সেবা করা ও সুখ দেওয়া পুত্রের কার্য্য এবং সেই নিমিত্ত তিনি আসিয়াছেন, নতুবা তাঁহার দেশে আসিবার কোন কারণ ছিল না। তিনি গুরুর নিকট ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, সে ব্রত ভঙ্গ করিলে পতিত হইবেন। যাহাতে তাঁহার সেই ব্রত ভঙ্গ না হয়, তাহাই যেন

তাঁহারা করেন। ইহা বলিয়া অতি কাতরে ঠাকুর মহাশয় পিতা-মাতাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। বলিলেন "মন স্বভাবতঃ দুর্ব্বার, বিষয়ে লোভী, আবার যদি আমায় আপনাদের বিষয়ের মধ্যে থাকিতে হয়, তবে আমার প্রলোভন লক্ষগুণ বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি, এই রাজধানীতে আমার থাকা উচিত নয়; কিন্তু করি কি, আপনাদের স্নেহে আমাকে এখানে রাখিতেছে। যাহাতে আমার ধর্ম্ম রক্ষা হয়, তাহা আপনারা করিবেন।" নরুর মাতা পিতা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

ঠাকুর মহাশয় বাড়ীর ভিতরে গমন করিলেন না, ঠাকুর বাড়ী রহিলেন। স্বপাকে একবার আহার, তিন সন্ধ্যা স্নান, ও দিবানিশি ভজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতাপিতাকে দিনান্তে একবার মাত্র প্রণাম ও স্নেহ-সম্ভাষণ করেন, তাহাতেই মাতাপিতা কৃতার্থ। কারণ ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন করিয়া আর তাঁহাকে তাঁহাদের পুত্র জ্ঞান রহিল না। মাতা পিতা ও গ্রামস্থ তাবৎ লোকের মন ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে দ্রব হইল ও সকলেরই মনে ভক্তির উদয় হইল। রাজকুমারকে দেখিতে দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিতে লাগিল। কিন্তু তিনি এখন আর রাজকুমার নহেন, এখন তিনি একজন প্রেম-ভক্তির মূর্ত্তিমান্ উদাসীন।

মাতা পিতার আগ্রহে ঠাকুর মহাশয় নিজের কাহিনী সমুদায় বলিলেন। তাঁহার কি ব্রত তাহাও বলিলেন। তিনি উদাসীন ব্রত লইয়াছেন। বিবাহ করা ত অনেক দূরের কথা, বিষয়ীর অন্ন পর্য্যন্তও তিনি গ্রহণ করিবেন না। সংসার মধ্যে থাকিয়া তাঁহার এই কঠোর ব্রত পালন করা কঠিন হইবে, তবু তিনি তাঁহাদের স্নেহে বশীভূত হইয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে খেতরি বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তৎ-

পরে বলিলেন, "কিন্তু এখন যদি আপনারা স্নেহে বিহ্বল হইয়া আমাকে সংসার মধ্যে আনিবার যত্ন করেন, তবে কাজেই আমার আপনাদের চরণ দর্শন সুখ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হইবে।"

তখন মাতা পিতা ভীত হইয়া বলিলেন, "বাপ! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। আমরা তোমার দর্শন পাইলেই কৃতার্থ হইব। এই শেষ কালে আমাদের ফেলিয়া যাইও না।"

কয়েক দিবস পরে, শ্যামানন্দ সম্বন্ধে শ্রীজীবের আজ্ঞা ঠাকুর মহাশয়ের স্মরণ হইল। তখন পিতাকে বলিলেন যে, শ্যামানন্দের সহিত দুই জন লোক দিতে হইবে, তিনি স্বদেশে যাইবেন। পিতা সেই কথা অনুসারে খরচ সমেত দুই জন লোক দিলেন, ও ঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দকে বিদায় করিলেন।

উভয়ের বিরহে উভয়ে কাতর হইলেন। ঠাকুর মহাশয় পদ্মাবতী তীর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আগমন করিলেন। শ্যামানন্দ নৌকায় উঠিলেন ও ঠাকুর মহাশয় তীরে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুখ দুঃখের একমাত্র সাথী, তিনিও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন!

গ্রন্থ চুরির কথা।

এদিকে বৃন্দাবনের অস্ত্রধারী ও গাড়োয়ানগণ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল, এবং শ্রীজীব গোস্বামীর হস্তে আচার্য্য প্রভুর সংস্কৃত পত্র দিল। পত্র পড়িয়া শ্রীজীবের হৃদয় ফাটিয়া গেল, কিন্তু তবু ভক্তির প্রভাবে স্থির রহিলেন। ধীরে ধীরে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট, ও পরে ভট্ট গোস্বামীর নিকট যাইয়া সমস্ত সংবাদ বলিলেন। উভয়ে দুঃখের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। জীব গোস্বামী টলিলেন না, কিন্তু বিষাদ-সাগরে ডুবিলেন। এই সংবাদ রাধাকুণ্ডের তীরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট গেল। তিনি এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এক স্থানে পৃথক্ পৃথক্ কুটীরে বাস করেন। উভয়ে অতি বৃদ্ধ। দাস গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের নিমিত্ত রোদন করিয়া অন্ধ হইয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী অন্ধ হয়েন নাই, কিন্তু চলৎশক্তি প্রায় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের এই দুই কৃপাপাত্র এই সংবাদ পাইয়া বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন। সেবকগণ তাঁহাকে উঠাইলেন বটে, কিন্তু শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর কোলে, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম জপ করিতে করিতে তিনি গোলকধামে গমন করিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সঙ্গীহারা হইয়া কি দশা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা আর বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। আমার সাধ্যও নাই।

এদিকে আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দকে বিদায় করিয়া দিয়া, কয়েক দিবস নানা গ্রামে গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোন

অনুসন্ধান পাইলেন না। পরে রাজার সাহায্য পাইবেন আশা করিয়া রাজধানী বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইলেন। পরিধান একখানি কৌপিন, আর দেড় হস্ত পরিমিত বহির্ব্বাস, (প্রেমবিলাসে) তাহা আবার অতিশয় জীর্ণ। সম্বল এই, সঙ্গে আর কিছুই নাই। এই অবস্থায় সেই পরম সুন্দর যুবক পাগলের ন্যায় নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

যখন যাহা মিলে, তখন তাহা আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন। যেখানে স্থান পান, সেখানে শয়ন করেন। জীর্ণ কলেবর, চলিতে অঙ্গ কাঁপে। দুঃখে মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, নয়নের জল অন্তর্হিত হইয়াছে, আর দিবানিশি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন। এই অবস্থায় দশ দিবস বন বিষ্ণুপুর নগরে অতিবাহিত করিলেন। কোন কার্য্যই হইল না। কেমন করিয়া এই দশ দিবস অতিবাহিত করিলেন, তাহা ভগবান জানেন। এক দিবস হতাশ হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ-কুমার সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, এটী ভদ্রলোক, এবং সরল ও বুদ্ধিমান। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি করেন কোথায় যাইতেছেন?" ব্রাহ্মণ-কুমার বলিলেন, তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন, ও রাজার আশ্রয়ে বাস করেন। "তুমি কি পাঠ কর," এই কথা জিজ্ঞাসা করায় ক্রমে শাস্ত্রালাপ হইতে লাগিল। একটু আলাপ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ-কুমার দেখিলেন, যে জীর্ণ শীর্ণ পাগলটি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। তখন ব্রাহ্মণ-কুমার যত্ন করিয়া আচার্য্য প্রভুকে তাঁহার বাড়ী,—নদীর ও-পারে নগরের অর্দ্ধক্রোশ দূরে, দেউলি গ্রামে লইয়া গেলেন।

আচার্য্য প্রভু সেই খানে ভোজন করিয়া পরে শুনিলেন যে, বিপ্রকুমারের নাম কৃষ্ণবল্লভ। রাজার নাম বীর হাম্বীর, মল্লবংশীয় রাজপুত জাতি। আরও শুনিলেন যে, রাজা অতিশয় দুরন্ত হইয়াছেন,

বল দ্বারা অন্যের ধন হরণ করেন। কিন্তু যদিও এরূপ কুকর্ম্মশালী, তবু পিতা পিতামহের প্রণালী-ক্রমে পূজা অর্চ্চনা ও নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতে আচার্য্য প্রভু ব্রাহ্মণ-কুমারকে বলিলেন, "তুমি আমাকে রাজসভায় লইয়া যাইতে পার?" তাহাতে কৃষ্ণবল্লভ উত্তর করিলেন, "হাঁ, পারি।"

এইরূপে আচার্য্য প্রভু এক দিবস রাজসভায় নীত হইলেন, এবং এক কোণে বসিয়া ভাগবত পাঠ শুনিলেন। পরদিবস আবার গমন করিয়া একটু অগ্রবর্ত্তী হইয়া বসিলেন। রাস পঞ্চাধ্যায় পড়া হইতেছে। ভাগবত-পাঠক কু-অর্থ করিতেছেন, আর সেখানে এমন কেহ নাই যে, তাঁহার প্রতিবাদ করেন। তখন আচার্য্য প্রভু সাহসী হইয়া বলিলেন, "আপনি যে অর্থ করিতেছেন, উহা গ্রন্থের প্রকৃত অর্থ নহে।" এই কথা শুনিয়া ভাগবত-পাঠক মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, ও আচার্য্য প্রভুর প্রতি ঘোর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

রাজা তখন আচার্য্য প্রভুর প্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন যে এক পরম সুন্দর উদাসীন যুবা এক কোণে বসিয়া আছেন। আচার্য্য প্রভুকে দেখিয়া রাজার চিত্ত প্রফুল্ল হইল। তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা তুমি পাঠ কর, দেখি তোমার অর্থ কিরূপ!" এই কথা শুনিয়া আচার্য্য প্রভু অগ্রবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থ লইয়া বসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ধ্যান করিয়া গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করিলেন। এত দিন গ্রন্থের কথা ভাবিতেছিলেন, তখন প্রাণনাথের কথা মনে পড়িল। বহুকাল পরে শ্রীমদ্ভাগবত পাইয়া আচার্য্য প্রভুর প্রাণ এলাইয়া গেল। প্রেমানন্দ-অশ্রুতে অন্ধ হইয়া তিনি পাঠ করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিলেন। অনেক ধৈর্য্য ধরিয়া সুস্বরে এক এক শ্লোকের নানাবিধ অর্থ করিতে লাগিলেন।

পাঠ শুনিয়া রাজা একেবারে মুগ্ধ হইলেন। পাঠ-সমাপ্ত হইলে, নৃপতি, আচার্য্য প্রভুর বাসা করিয়া দিবার আজ্ঞা দিলেন। আচার্য্য প্রভু সেই বাসায় আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে ভাগবত-পাঠক আসিলেন, এবং কৃষ্ণবল্লভও আসিলেন। ভাগবত-পাঠক আচার্য্য প্রভুর পাঠ শুনিয়া দ্রবীভূত হইয়াছেন, তাঁহার বিদ্বেষ ভাব গিয়াছে, গিয়া ভক্তির উদয় হইয়াছে। তিনি আচার্য্য প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন, "আপনি আমার গুরু, আমাকে ক্ষমা করুন।" আচার্য্য প্রভু হাসিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। তিনি গমন করিলে, রাত্রিযোগে গোপনে রাজা স্বয়ং তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজাকে দেখিয়া আচার্য্য প্রভু অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া বলিলেন, ঠাকুর রন্ধন করিতেছেন না কেন? আচার্য্য প্রভু বলিলেন তিনি এক সন্ধ্যা আহার করেন। তখন রাজা দুগ্ধ ও তাঁহার উপযোগী আহার আনাইয়া আচার্য্য প্রভুকে ভোজন করাইলেন, আর তাঁহাকে শয়ন করাইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

প্রভাতে রাজা আবার আসিয়া উপস্থিত! আচার্য্য প্রভু বলিলেন, প্রভাতে রাজ-দর্শন বড় মঙ্গলের কথা। রাজা বলিলেন "তুমি আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছ, আমি তাহা জানিয়াছি। আপাততঃ এই দুটী জলপাত্র গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।" ইহাই বলিয়া দুইটী নূতন জলপাত্র সম্মুখে রাখিলেন। পরে সেই ভাগবত-পাঠককে, আচার্য্য প্রভুর পরিচর্য্যা করিতে রাখিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা ক্ষণেক বিলম্বে আবার আসিয়া আচার্য্য প্রভুর ভোজন দর্শন করিলেন। বৈকালে আবার ভাগবত পাঠ আরম্ভ হইল। রাজার তখন, "দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে চাঁদমুখ না দেখিলে" ভাব হইয়াছে। তিনি আচার্য্য প্রভুকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না। তাই আসিতেছেন আর

যাইতেছেন। নানা ছুতা করিয়া আসিতেছেন, আর বাধ্য হইয়া যাইতেছেন।

সে দিবস পাঠ আরম্ভ হইতে হইতেই রাজা অধীর হইলেন। দুই হস্তে আপনার বুকে আঘাত করিতে লাগিলেন। রাজার আর্ত্তনাদ শুনিয়া সভাস্থ সমুদয় লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। "প্রভু গৌরাঙ্গ! তুমি জগাই মাধাইর উদ্ধার করিলে, কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা আমি অধম। প্রভো! আমি ক্ষমা মাগিবার পথ রাখি নাই," ইত্যাদি ইত্যাদি বচনে রাজা করুণস্বরে ক্রন্দন, ও আপন শিরে এবং বুকে করাঘাত করিতে লাগিলেন। রাজার দুঃখ দেখিয়া আচার্য্য প্রভু পাঠ বন্ধ করিলেন ও মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজা ও আচার্য্য প্রভু নির্জ্জনে বসিলেন। রাজা আচার্য্য প্রভুকে বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি কে? বাড়ী কোথায়? এ অধমের এখানে কেন আসিয়াছেন? আমাকে কৃপা করিয়া সমস্ত বলিতে আজ্ঞা হউক।"

তখন আচার্য্য প্রভু সমুদয় কাহিনী বলিলেন, আর গোপালপুরে যে গ্রন্থ চুরি হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "যদি সে গ্রন্থ না পাই, তবে প্রাণ রাখিব না। আমি সেই গ্রন্থের অনুসন্ধানে তোমার নগরে তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি। তুমি আমাকে সেই গ্রন্থ উদ্ধার করিয়া দাও।" আচার্য্য প্রভু ইহা বলিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

রাজা বলিলেন, আমাকে জগতের মধ্যে দীন দেখিয়া, আমার প্রতি শ্রীভগবানের বিশেষ দয়া হইয়াছে, তাই আপনাকে তিনি পাঠাইয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থ না আসিলে আপনি আসিবেন কেন? গ্রন্থ এই নিমিত্ত অগ্রে আসিয়াছেন। প্রভো! আমি নামে রাজা, কিন্তু কার্য্যে

দস্যু। ধন বিবেচনায় আমি আপনার গাড়ী লুট করাইয়া আনাইয়াছিলাম। প্রভো! গ্রন্থ সমুদয় আছেন, এখন আমাকে উদ্ধার করিয়া ইহার সমুচিত দণ্ড করুন।" ইহাই বলিয়া আচার্য্য প্রভুর দুইটী চরণ ধরিয়া রাজা ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন।

কথা এই, ধনলোভে রাজা লোক দ্বারা সম্পুট লুণ্ঠন করিয়াছেন। বাড়ীতে সম্পুট আনিয়া উহা খুলিয়াছেন, খুলিয়া দেখিলেন যে উহার মধ্যে কেবল কতকগুলি গ্রন্থ। দু এক পাত উল্টাইয়া দেখিয়াছেন যে তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন, গ্রন্থে তাঁহারই কথা লেখা। সুতরাং রাজা জব্দের একশেষ হইয়াছেন, গ্রন্থগুলি রাজার দিবানিশি যন্ত্রণার স্বরূপ হইয়াছে।

আচার্য্য প্রভুর দর্শনে রাজা অনুমান করিয়াছেন যে, গ্রন্থের অধিকারী তিনি। তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু লজ্জায় পারিতেছেন না। পরে বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-কথারূপ অমৃতপানে সেই অভিমান নষ্ট হইলে, তখন নিষ্কপটে স্বীকার করিলেন যে, যে অধম গ্রন্থ চুরি করিয়াছে, সে আর কেহ নয়—তিনি।

আচার্য্য প্রভু রাজার কথায় অচেতনবৎ হইয়া প্রথমে কিছুই পরিস্কার রূপে বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন তিনি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, গ্রন্থ সমুদয় উত্তম অবস্থায় আছেন, তখন রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! তুমি আমার চরণ ছাড়িয়া দাও। তোমার উদ্ধার পরে হইবে, এখন আমি একটু নৃত্য করি।" ইহাই বলিয়া আচার্য্য প্রভু, গৌর নিতাই, ও রূপ সনাতন ভট্ট প্রভৃতি গোস্বামিগণের নাম করিয়া, পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। একটু পরে বাহ্য জ্ঞান পাইয়া বলিতেছেন, "চল মহারাজ, গ্রন্থগুলি আগে দর্শন করি।"

রাজা আচার্য্য প্রভুকে ভাণ্ডারে লইয়া গেলেন, ও সেই পশ্চিম দেশের সিন্ধুকটী দেখাইলেন। সিন্ধুক দেখিয়া আচার্য্য প্রভু অগ্রে ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পরে সম্পুট খুলিয়া দেখেন যে, উহার মধ্যে নিহিত রত্নগুলি ঠিক অবস্থায় আছে। তখন আচার্য্য প্রভু রাজাকে বলিলেন যে, গ্রন্থের পূজা করিতে হইবে। রাজা পূজার সমুদয় আয়োজন করিয়া দিলেন। গ্রন্থ-পূজা হইল, ও সেই দিবস রাজাকে কৃষ্ণ-নাম শুনান হইল।

তাহার পরে আচার্য্য প্রভু রাজাকে দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করিলেন। কৃষ্ণবল্লভও শিষ্য হইলেন; যিনি প্রথমে ভাগবতের অর্থ লইয়া দ্বন্দ্ব করিয়াছিলেন, তিনিও আচার্য্য প্রভুর শরণ লইলেন। রাজার নাম বীর হাম্বীর, কিন্তু এখন তাঁহার নাম হইল "হরিচরণ দাস।"

বিষ্ণুপুরে সেই প্রথম কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। পরিশেষে সঙ্গীতে ও নানা কারণে বিষ্ণুপুর ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয় স্থান হইল। অদ্যাবধি বিষ্ণুপুর সঙ্গীত বিষয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে একটী প্রধান স্থান।

রাজা বীর হাম্বীর রচিত একটী পদ এই :—

প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পূরাইলে মনের আশ,
তুয়া পদে কি বলিব আর।
আছিনু বিষয় কীট, বড়ই লাগিত মিট,
ঘুচাইলা রাজ অহঙ্কার॥
করিতুঁ গরল পান, রহিল ডাহিনে বাম,
দেখাইলা অমিয়ার ধার।
পিব পিব করে মন সব লাগে উচাটন,
এমতি তোমার ব্যবহার॥

রাধা পদ সুধারাশি, সে পদে করিলা দাসী,
গোরাপদে বাঁন্ধি দিলা চিত।
শ্রীরাধারমণ সহ, দেখাইয়া কুঞ্জ গেহ,
জানাইলা দুহুঁ প্রেমা রীত॥
কালিন্দীর কূলে যাই, সখীগণে ধাওয়া ধাই,
রাই কানু বিহরই সুখে।
এ বীর হাম্বীর হিয়া, ব্রজভূমি সদা ধেয়া,
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে॥

আচার্য্য প্রভু আনিতে এই সমুদয় গ্রন্থের অনুলিপি সমস্ত গৌড় দেশ ব্যাপিল। কিন্তু আদি গ্রন্থ গুলি রাজার বাড়ী রহিলেন ও চির দিন ছিলেন, এবং অদ্যাবধি কিছু কিছু আছেন শুনিতে পাই। তবে অনেক গ্রন্থ নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই বিষ্ণুপুরে পরিশেষে নাম্-জপ "রাজার বেগার" বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। নাম-জপ না করিলে দণ্ড হইত তাই প্রজাগণ কেহ কেহ এই নাম-জপকে "রাজার বেগার" বলিত।

তখন আচার্য্য প্রভু গড়েরহাট খেতরিতে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট ও বৃন্দাবনে গ্রন্থ প্রাপ্তির সমাচার পাঠাইবার নিমিত্ত রাজাকে আজ্ঞা করিলেন। আচার্য্য প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীকে পত্র লিখিলেন। তাহাতে পূর্ব্ব লোক বিদায়ের পর যে যে ঘটনা হইয়াছিল সমুদয় বর্ণন করিলেন। এই সংবাদ বৃন্দাবনে গোস্বামিগণ পাইয়া আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া কয়েক দিবস পরে অপ্রকট হয়েন। কিন্তু "কর্ণানন্দরস" গ্রন্থকার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কবিরাজ গোস্বামী সেবার

অন্তর্ধান করেন নাই। যখন গ্রন্থ প্রাপ্তি সংবাদ বৃন্দাবনে যায়, তখন তিনি মানব দেহে ছিলেন ও তিনি এই শুভ সংবাদ শুনিয়াছিলেন। কর্ণানন্দ গ্রন্থ প্রেমবিলাসের পরে লেখা, সুতরাং তাঁহার কথাই গ্রাহ্য। ইহা বড় সুখের বিষয় যে, চরিতামৃত গৌড়ে পৌছিয়াছে এ কথা কবিরাজ গোস্বামী শুনিয়াছিলেন। এ দিকে খেতরিতে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট আচার্য্য প্রভুর পত্র লইয়া দুই লোক উপস্থিত হইল। ঠাকুর মহাশয় আচার্য্য প্রভুর লোক শুনিয়া অতি ব্যগ্র হইয়া তাহাদিগকে ডাকাইলেন। আচার্য্য প্রভুর পত্র পাঠ করিয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন। তখনি আদেশ করিলেন যে, রাজ্যের মধ্যে উৎসব করা হউক। এই কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা পঞ্চ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যে নানাবিধ উৎসব করিলেন। প্রভুর মধুর কাণ্ড দেখুন। যখন গ্রন্থ চুরি যায়, তখন আচার্য্য প্রভু প্রভৃতি সকলে মনে মনে প্রভুর উপর একটু রাগ করিয়াছিলেন। অবশ্য মনে মনে বলিতেও সাহস হয় নাই, কিন্তু তবু সম্ভবতঃ মনে এ ভাব উদয় হইয়াছিল যে, "প্রভু তুমি এ গ্রন্থগুলি চুরি করাইয়া ভাল কাজ কর নাই।" কিন্তু পরে আচার্য্য প্রভু দেখিলেন যে, শ্রীভগবান তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বুঝেন। আচার্য্য প্রভু গ্রন্থ লইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার সম্বল কান্থা ও কম্বল। এখন আচার্য্য প্রভু বিষ্ণুপুরে রাজার রাজা হইলেন। রাজার সাহায্যে, তাঁহার যে, কার্য্য, অর্থাৎ ভক্তি-ধর্ম্ম ও গ্রন্থ প্রচার, তাহা প্রচুর পরিমাণে হইল। দেশ টলমল করিয়া উঠিল। অতএব, যে গ্রন্থ চুরি তিনি একটা বড় দুর্ভাগ্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা বিশুদ্ধ সৌভাগ্যের কারণ হইল।

আবার ভ্রমণ।

—:*:—

ইহার কিছু কাল পরেই ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থান দর্শন করিবার নিমিত্ত মাতা পিতার নিকট বিদায় মাগিলেন। বাসনা, শ্রীনবদ্বীপ দর্শন করিয়া শান্তিপুর ও খড়দহ হইয়া একবারে নীলাচলে যাইবেন। পিতা মাতা তাঁহাকে নিষেধ আর কিরূপে করিবেন, কিন্তু সমভিব্যাহারে সাহায্যের নিমিত্ত লোক দিতে চাহিলেন। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় তাহা লইলেন না। তীর্থ দর্শনে একাকী, কি দুই একটী মর্ম্মী সঙ্গী ব্যতীত ঘটা করিয়া যাইতে নাই, ইহা শ্রীপ্রভুর আজ্ঞা। কিন্তু সেরূপ তীর্থ দর্শন এখন আর নাই।

ঠাকুর মহাশয় শ্রীনবদ্বীপে দ্রুতবেগে গমন করিয়া নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। পথে আর কোথাও কোন পবিত্র স্থান দর্শন করিলেন না গ্রামের প্রান্তভাগে বৃক্ষতলে বসিয়া নবদ্বীপ পানে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। "প্রভু! আমাকে নবদ্বীপে কেন আনিলে? আমি এখন কি দেখিতে যাইতেছি? কোথায় তুমি, কোথায় বা তোমার পরিজন, আর কোথায় বা তোমার ভক্তগণ? হা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী! আমি যদি আর কিছু কাল পূর্ব্বে আসিতাম, তবে তোমার চরণ-রেণু পাইতাম। এখন আমি শূন্য নদীয়ায় কি সুখে যাইতেছি?" ইহাই বলিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। যাঁহারা নরোত্তমের সময়ের লোক, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীনবদ্বীপ জলন্ত অঙ্গার। বৃন্দাবন দাস, শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে বারম্বার বলিতেছেন, "পাপিষ্ঠ জনম তখন হইল না, তাই লীলা দেখিতে পাইলাম না।" বৃন্দাবন দাসের ক্ষোভ এই যে,

আর কিছুকাল পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিলে প্রভুর লীলা দর্শন করিতে পারিতেন। নরোত্তমেরও সেই দুঃখ। লীলার সমুদয় চিহ্ন রহিয়াছে, কেবল নায়কগণ নাই। প্রভুর বাড়ী আছে, প্রভু নাই, শচী নাই, এমন কি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও নাই।

ঠাকুর মহাশয় একটু শান্ত হইয়া শ্রীনবদ্বীপের মায়াপুর গ্রামে প্রবেশ করিলেন। পথে একজন তেজস্বী অতি সাধু বৈষ্ণব দর্শন করিয়া ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া জিজাসা করিলেন যে, প্রভুর বাড়ী কোন পথে যাইবেন। ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়া সেই সাধু বুঝিলেন যে, ইনি একজন সাধুপুরুষ। তিনি তখন নরোত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু তুমি কে?" নরোত্তম আপনার নাম ও বাড়ী বলিলেন।

তখন আচার্য্য প্রভুর, ঠাকুর মহাশয়ের ও শ্যামানন্দের নাম গৌড়ময় হইয়াছে। গ্রন্থ চুরি ও গ্রন্থ প্রাপ্তির কথা সকলেই শুনিয়াছেন। সাধু, নরোত্তমের নাম শুনিয়া, বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া বলিলেন, "বাপু! আমি হতভাগ্য শুক্লাম্বর। প্রভুর পার্ষদের মধ্যে আমি আর দুই একটী দুঃখী কাঙ্গাল প্রভুর বিরহ দুঃখ ভোগ করিতে বাঁচিয়া আছি।" তখন দুই জনে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা মনে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

শুক্লাম্বর, ঠাকুর মহাশয়কে প্রভুর বাড়ী লইয়া গেলেন। পাঠক মহাশয় চলুন, আমরাও সঙ্গে যাই। মায়াপুরে প্রবেশ করিয়া শুক্লাম্বর বলিলেন, "এই দেখ প্রভুর বাড়ী!" কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ঠাকুর মহাশয়, 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া আঙ্গিনায় পড়িলেন ও ধুলায় লুন্ঠিত হইতে লাগিলেন। সেখানে দামোদর পণ্ডিত ও ঈশান ছিলেন। দামোদর পণ্ডিত প্রভুর প্রিয়ভক্ত ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অভিভাবক ছিলেন। সম্প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অপ্রকট হওয়ায় দামোদর

পণ্ডিত শোকে প্রায় পাগলের মত হইয়াছেন। ঈশান অগ্রে শচী দেবীর সেবক ছিলেন। পরে তাঁহার অপ্রকটে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবক হয়েন। এখন প্রভুর বাড়ীতে আর কেহ নাই, কেবল শূন্য ঘরে তাঁহারা দুই জনে থাকেন। ঠাকুর মহাশয়ের দশা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। পণ্ডিত দামোদর, শুক্লাম্বরের নিকট ঠাকুর মহাশয়ের পরিচয় লইলেন, "নরোত্তম! আমাদের, দুঃখ ভাবিয়া তোমার দুঃখ স্মরণ কর। বল দেখি, আমরা কি সুখে বাঁচিয়া আছি।"

ঠাকুর মহাশয় ধুলায় ধুসরিত হইয়া আঙ্গিনায় বসিলেন। হায়! যে স্থান শ্রীগৌরাঙ্গের নয়নজলে কর্দ্দমময় থাকিত, যে স্থানে দিবানিশি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইত, যে বাড়ী বেষ্টন করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিত, সেই স্থানের আজ এ কি দশা! ইহা ভাবিতে ভাবিতে ঠাকুর মহাশয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তখন ঈশান ও শুক্লাম্বর ঠাকুর মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহাকে প্রভুর লীলার স্থান ও দ্রব্যগুলি দর্শন করাইতে লাগিলেন। এই পুষ্পবন, এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে শ্রীবাসকে আলিঙ্গন প্রদান করেন। এই ঠাকুরঘর। এই প্রভুর শয়নঘর। এই শচী মাতার শয়নঘর। এই রন্ধনশালা। এই সব প্রভুর পুথি। এই তাঁহার বসিবার কম্বল। এই প্রভুর পায়ের খড়ম। এই প্রভুর গলার চাদর। এই প্রভুর পট্টবস্ত্র। এই প্রভুর পায়ের নূপুর। এই প্রভুর জলপাত্র। এই প্রভুর পালঙ্ক। এই প্রভুর শয্যা, উহা আর উঠান হয় নাই, প্রভু যে অবস্থায় উহা রাখিয়া যান সেই অবস্থায়ই আছে। দেবী এই পালঙ্কের নিচে ভূমিতলে শয়ন করিতেন। তৎপরে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার কাহিনী বলিতে লাগিলেন। দেবী এক নূতন পাত্রে তণ্ডুল রাখিয়া, বোল নাম জপ হইলে আর এক নূতন পাত্রে উহা হইতে একটী করিয়া তণ্ডুল রাখিতেন। এইরূপে যতগুলি তণ্ডুল হইত, তাহা শ্রীগৌ-

রাঙ্গকে অর্পণ করিয়া আপনি প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার বাটী প্রাচীরে বেষ্টিত ও সর্ব্বদা কপাট দ্বারা আবদ্ধ থাকিত। প্রাচীরে সিঁড়ি ছিল, সেই সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দামোদর পণ্ডিত বাটীর ভিতর জল লইয়া যাইতেন। দেবী দিবানিশি দাসীগণ পরিবেষ্টিত থাকিতেন, আর দিবানিশি রোদন করিতেন। তিনি শচীর অদর্শনে আর প্রাচীরের বাহিরে গমন করেন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রধানা সখী কাঞ্চনা, ব্রাহ্মণ কন্যা, তখন অদর্শন হইয়াছেন।

ঠাকুর মহাশয় কয়েক দিবস নবদ্বীপে প্রভুর বাড়ীতে থাকিলেন। তাঁহার দিবানিশি বিহ্বল অবস্থা। রাত্রিতে, আর কখন কখন দিবসেও তিনি প্রভুর লীলা স্বপ্নে দেখেন, ও দামোদর ও ঈশানের নিকট প্রভুর লীলা কথা শ্রবণ করেন। ক্রমে প্রভুর বাড়ীর বাহিরে আসিলেন। শ্রীবাসের ভ্রাতা,শ্রীপতি ও শ্রীনিধির সহিত তাঁহার দেখা হইল। শ্রীগৌ-রাঙ্গের লীলাস্থান সমুদয় দেখিলেন। কোথা শিশুকালে প্রভু ক্রীড়া করিতেন, কোথা পড়িতেন, কোথা বসিতেন, কোথা বেড়াইতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি দিবানিশি দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দামোদর ও ঈশান তাঁহার দশা দেখিয়া, তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র নীলাচলে যাইতে যত্ন করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুর মহাশয় শ্রীপ্রভুর ভক্তগণকে ও প্রভুর বাড়ী প্রণাম করিয়া শান্তিপুরে চলিলেন। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈ-তের স্থান দর্শন করিয়া অম্বিকায় গেলেন, সেখানে শ্যামানন্দের গুরু হৃদয়-চৈতন্য ঠাকুরের ওখানে যাইয়া গৌর-নিতাই বিগ্রহ দর্শন করিলেন। সেখান হইতে উদ্ধারণ দত্তের স্থান ত্রিবেণী দর্শন করিয়া খড়দহে গমন করিলেন।

তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গোপন হইয়াছে। ঠাকুর মহাশয়ের আগমন শুনিয়া জাহ্নবা গোস্বামী তাঁহাকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন।

বীরভদ্র ও জাহ্নবা দেবী, ঠাকুর মহাশয়কে কয়েক দিবস যত্নে রাখিয়া, পরে নীলাচলে যাইতে অনুমতি দিলেন। সেখান হইতে, উদাসীন পথিক অভিরামের স্থান খানাকুল কৃষ্ণনগর দর্শন করিয়া নীলাচলাভিমুখে ধাইলেন।

প্রভু যে পথে নীলাচলে গিয়াছিলেন, ঠাকুর মহাশয়ও সেই পথে চলিলেন। খড়দহ হইতে সেই পথের কাহিনী সমুদয় লিখিয়া লইয়া গেলেন। যেখানে যে রাত্রি প্রভু বাস করেন, ঠাকুর মহাশয় সেই সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। যেখানে নিত্যানন্দ প্রভু গৌরাঙ্গের দণ্ড ভঙ্গ করেন, সেখানে প্রেমে বিহ্বল হইলেন। যেখানে প্রভু প্রথমে জগন্নাথের চুড়া দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঐ দেখ একজন কৃষ্ণবর্ণ শিশু আমাকে ডাকিতেছেন," সেখানে যাইয়া ঠাকুর মহাশয় সেই কথা স্মরণ করিয়া চেতনা শূন্য হইলেন। তাহার পর "ঐ জগন্নাথের চুড়া" বলিয়া, ঠাকুর মহাশয় দৌড়িলেন। নিকটে গমন করিয়া জগন্নাথ মন্দিরকে প্রণাম কারলেন, কিন্তু তখন মধ্যে প্রবেশ করিলেন না।

লোক মুখে গোপীনাথাচার্য্যের বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শ্রীক্ষেত্র মধ্যে প্রভুর প্রিয় গোপীনাথ গৌড়ীয়গণের প্রধান। গোপীনাথ তখন অবশ্য অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। প্রভুর নবদ্বীপ বিহারের সঙ্গী কেবল মাত্র তিনি তখন তথায় আছেন। ঠাকুর মহাশয় গোপীনাথকে প্রণাম করিলেন। গোপীনাথ শুনিলেন যে নরোত্তম প্রণাম করিতেছেন, আর তখনি চিনিতে পারিলেন। ঠাকুর মহাশয় যে গৌরাঙ্গের আকর্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, গ্রন্থ চুরি হইয়াছিল, আবার পাওয়া গিয়াছে, এ সংবাদ তখন প্রভুর গণ মাত্রেই অবগত হইয়াছেন। গোপীনাথ নরোত্তমকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

নরোত্তম একটু সুস্থ হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে জগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন। জগন্নাথ দর্শন করা হইল, কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি রহিয়াছে। তখন তিনি কাশী মিশ্রের আলয় অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের যে বাসস্থান ছিল, সেখানে যাইতে চাহিলেন। শূন্য শ্রীনবদ্বীপ দর্শন করাও যেরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার, শূন্য শ্রীনীলাচল পুরী দেখাও সেইরূপ ভয়ঙ্কর। প্রভুর বাড়ীতে গমন করিয়া ঠাকুর মহাশয় অচেতন হইয়া পড়িলেন।

প্রভুর বাড়ীর সেবাইত শ্রীগোপাল গুরু। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয় বক্রেশ্বরের শিষ্য। বক্রেশ্বরের নৃত্য প্রায় শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যের ন্যায় মধুর ছিল। বক্রেশ্বরের সৌন্দর্য্য প্রায় প্রভুর ন্যায় ছিল। বক্রেশ্বরকে প্রভু এত আনন্দ দিয়াছিলেন যে তিনি ক্রমান্বয়ে দুই দিবারাত্রি নৃত্য করিতে পারিতেন। বক্রেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসক, তিনি আর কাহাকে জানিতেন না। তিনি নিমাই পণ্ডিতকে উপাসনা করিতেন। তিনি বলিতেন যে প্রভুর অন্যান্য ভাব ঐশ্বর্য্য সম্বলিত। নিমাই পণ্ডিত ভাবেই কেবল প্রভুর শুদ্ধ মাধুর্য্য ভাব পাওয়া যায়। তাঁহা হইতে নিমানন্দ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এই সম্প্রদায়ের প্রথম নেতা বক্রেশ্বর। তাঁহার অপ্রকটে গোপাল গুরু প্রধান হইলেন। ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর গদি পাইলেন।

ঠাকুর মহাশয় চেতন পাইয়া এইরূপে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, "প্রভু! আর যদি কিছুকাল অগ্রে জন্মিতাম, তবে তোমাকে দেখিতে পাইতাম। প্রভু আমাকে নীলাচলে কেন আনিলেন? আমি কি দেখিতে আইলাম?" ঠাকুর মহাশয়কে বড় কাতর দেখিয়া, গোপীনাথ তখন তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন ও ভাবিলেন সুস্থ করিয়া তাঁহাকে আবার লইয়া যাইবেন। স্নানান্তে প্রসাদ ভুঞ্জাইয়া আবার

দুই জনে প্রভুর বাড়ী চলিলেন। প্রভু অষ্টাদশ বর্ষ এই কাশী মিশ্রের আলয়ে বাস করিয়া সম্প্রতি অপ্রকট হইয়াছেন। ঠাকুর মহাশয় সেই কাশী মিশ্রের বাড়ীতে যাইয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। গোপীনাথ তাঁহাকে অনেক যত্ন করিয়া একটু শান্ত করিলেন, করিয়া প্রভুর নিদর্শন দেখাইতে লাগিলেন।

গোপীনাথ দেখাইতেছেন, "প্রভু এখানে এই আসনে বসিয়া সংখ্যা মালা জপ করিতেন। ঠাকুর মহাশয় ষাষ্টাঙ্গে আসন প্রণাম করিলেন, আসন মস্তকে ধরিলেন, আঘ্রাণ লইলেন, আর যেন শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ লাভ সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। পরে প্রভুর শয়ন ঘর দেখিলেন। প্রভু যে প্রস্তরের উপর শয়ন করিতেন, তাহা দেখিলেন। কদলী পত্র দ্বারা তাঁহার যে শয্যা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা অমনি রহিয়াছে। সেখানে প্রভুর অতি জীর্ণ কাঁথা খানি রহিয়াছে। সে সমস্ত ভূমি পবিত্র। ঠাকুর মহাশয় জানু পাতিয়া চলিলেন। তিনি ভাবিতেছেন ইহার প্রত্যেক রেণুতে প্রভুর শক্তি রহিয়াছে। সেই সম্মুখের প্রস্তরে প্রভু কলার পাতার শয্যা করিয়া শয়ন করিয়া থাকিতেন; শীতকালে সেই ছেড়া কাঁথা খানি দিয়া শীত নিবারণ করিতেন; এই সমুদয় কথা তখন ঠাকুর মহাশয়ের হৃদয়ে উদয় হওয়াতে, সেখানে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আর হৃদয়ের তাপ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত সেখানে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

পরে শুনিলেন যে, প্রভু ঐ প্রস্তরে শয়ন করিতেন, আর তাঁহার পদতলে দামোদর পণ্ডিতের (যিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অভিভাবক) কনিষ্ঠ শঙ্কর, দুই খানি চরণ বুকে করিয়া শয়ন করিতেন। ইহার কারণ এই যে, প্রভু বিহ্বল হইয়া রজনীযোগে কোথায় না যাইতে পারেন। তখন ঠাকুর মহাশয় শত শত ধন্যবাদ দিলেন। প্রভু দিবাভাগে ভোজ-

মাঝে এক দণ্ড কাল কোথায় মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেন, তাহা দেখিলেন। ঠাকুর মহাশয় যাহা দর্শন করেন, তাহাতেই তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন বোধ হইতে লাগিল।

পরে বাহিরে আসিলেন, নিকটে একখানা কুটীরে স্বরূপ দামোদর বাস করিতেন। প্রভুর অপ্রকটে তিনি মূর্চ্ছিত হয়েন ও কয়েক দিবস মাত্র জীবিত থাকিয়া প্রভুর ধামে গমন করেন। প্রভুর বিয়োগে স্বরূপের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া প্রাণ বাহির হয়। ঠাকুর মহাশয় স্বরূপের কুটীরে যাইয়া সেখানে গড়াগড়ি দিলেন। প্রভুর বাড়ীর অন্য দিকে হরিদাসের কুটীর। প্রভু এই হরিদাসের মৃত দেহ স্কন্ধে করিয়া সেই কুটীরের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয় প্রভুর ভক্ত-বৎসলতা মনে করিয়া সেই স্থান গদ গদ চিত্তে দর্শন করিলেন।

তাহার পরে, যেখানে দাঁড়াইয়া প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেন, ঠাকুর মহাশয় যেই স্থানে গেলেন। প্রভু গরুড়-স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেন। যে স্থানে হস্ত রাখিয়া বিহ্বল ভাবে প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেন, সে স্থানে তাঁহার হাতের চিহ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, সেই গরুড়-স্তম্ভের নিচে একটী গর্ত্ত আছে। দর্শন সুখে প্রভুর যে নয়নানন্দ অশ্রু বর্ষণ হইত, তাহাতে সেই গর্ত্তটী পরিপূর্ণ হইত।

প্রভু সমুদ্রতীরে কোথা বসিতেন, সে স্থান দেখিলেন। এইরূপে প্রভুর সমুদয় স্থল দর্শন করিয়া শ্রীগদাধরের গোপীনাথ-বিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলেন। এখানকার সেবাইত মামু গোঁসাই। প্রভু রহস্য করিয়া শান্তিপুরে তাঁহাকে "মামু" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। আর সেই হইতে তাঁহার নাম "মামু গোঁসাই" হইয়াছিল। ইনি গদাধরের শিষ্য ও তাঁহার সেবার অধিকারী। প্রভুর অদর্শনে শ্রীগদাধর কিছু কাল প্রকট ছিলেন। যত দিন প্রকট ছিলেন, এক মুহূর্ত্ত তাঁহার নয়নাশ্রু

নিবারিত হয় নাই। ঠাকুর মহাশয় গদাধরের আসন প্রণাম করিলেন, আর তাঁহার সকল স্থান দর্শন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এক নিয়ম ছিল যে, অপরাহ্ণে গদাধরের কুঞ্জে শ্রীভাগবত শুনিতে যাইতেন। শ্রীগদাধর পাঠ করিতেন আর প্রভু শ্রবণ করিতেন, সে স্থানও দেখিলেন। আর নয়ন জলে সিক্তিত সে ভাগবতও দর্শন করিলেন। তাহার পরে শ্রীহরিদাসের সমাধি দর্শন করিলেন। প্রভুর নীলাচলবাসী সমুদয় ভক্তগণের সহিত দেখা হইল। প্রধানের মধ্যে তখন শিখি মাহিতী, কানাই খুটিয়া, মকরাজ ও রামানন্দের ভ্রাতা বাণীনাথ জীবিত ছিলেন।

এই আঁধার নীলাচল, ইহার মধ্যেও ঠাকুর মহাশয়ের হৃদয়ে আনন্দ উত্থিত হইতে লাগিল। তাহার কারণ এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গের কিরূপ আদর, তাহা তিনি প্রতিক্ষণে সেখানে দেখিতে লাগিলেন। যদিও প্রভু কয়েক বৎসর অপ্রকট হইয়াছেন, তবু সকলেই শোক সন্তপ্ত। প্রভুর নাম করিবামাত্র আবাল বৃদ্ধ সকলেই রোদন করিয়া উঠে। নীলাচল শ্রীজগন্নাথের স্থান। কিন্তু প্রভুর তেজে জগন্নাথের তেজও খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। হইবারই কথা। চিরকালই জীবের নিকট অচল জগন্নাথ হইতে সচল জগন্নাথ বড় হইবেন।

নীলাচল হইতে বিদায় হইয়া ঠাকুর মহাশয় উৎকলে, নৃসিংহপুরে, শ্যামানন্দের স্থানে চলিলেন। শ্যামানন্দের পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল সদ্‌গোপ জাতি। অল্প বয়সে শ্যামানন্দ গৃহত্যাগ করিয়া অম্বিকা কালনায় আসিয়া হৃদয়ানন্দের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। সেখান হইতে ভারতবর্ষের তাবৎ তীর্থ দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েন। সেখানে তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া, শ্রীজীব গোস্বামী আপন নিকটে রাখিলেন, রাখিয়া ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। পরে আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আসিয়া নিজ দেশে ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

শ্যামানন্দের প্রভাবের কথা কি বলিব। ব্রাহ্মণেও তাঁহার চরণ শরণ করিতে লাগিলেন, ও রসিক মুরারী তাঁহার শিষ্য হইলেন। এইরূপ উক্ত আছে যে, তাঁহার শিষ্য রসিক সর্ব্বসমক্ষে রথারোহণ করিয়া গোলকে গমন করিয়াছেন।

জঙ্গলের পথ দিয়া ঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দের স্থানে উপস্থিত হইলেন। শ্যামানন্দ স্বগণ লইয়া ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। সকলেই ঠাকুর মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে দর্শন করেন নাই। যে "ঠাকুর মহাশয়" নাম বলিয়া শ্যামানন্দ ও তাঁহার গণ প্রেমে পুলকিত হইতেন, তিনি এখন তাঁহাদের সম্মুখে! শ্যামানন্দের বাড়ীতে দিবা নিশি উৎসব আরম্ভ হইল। কয়েক দিবস পরে ঠাকুর মহাশয় বিদায় চাহিলেন। বিদায় কালে বলিলেন যে, তিনি যদি কোন উৎসবে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে যেন শ্যামানন্দ শুভাগমন করেন। আর রসিক মুরারীকে বলিলেন, "বাপু, তুমিও যাইয়া আমার বাড়ী পবিত্র করিবা।" রসিক রোদন করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। শ্যামানন্দকে দেখিবার নিমিত্ত নীলাচলবাসী ভক্তগণ বড় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয়, তাঁহাকে নীলাচলে যাইতে আজ্ঞা করিয়া গৌড়ে আগমন করিলেন। আর ওদিক হইতে শ্যামানন্দও নীলাচলে গমন করিলেন।

ঠাকুর মহাশয় বরাবর শ্রীখণ্ডে আসিলেন। তখন শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর অপ্রকট হইয়াছেন। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গকে চামর ঢুলাইয়া সেবা করিতেন। ইঁহার অপেক্ষা প্রভুর প্রিয় আর কেহ ছিলেন না। প্রভুও ইঁহার প্রাণ, মন ও যথা সর্ব্বস্ব। নরহরি, এবং বাসু, গোবিন্দ ও মাধব ঘোষ, এই তিন ভ্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা প্রথমে বাঙ্গলা পদে বর্ণনা করেন। সরকার ঠাকুর চিরকুমার, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি সেবা করিতেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু তাঁহারই হস্তে গঠিত, আর অধিক

বলিবার প্রয়োজন নাই। যেমন শ্রীবৃন্দাবনে জীব গোস্বামী সকলের উপর কর্ত্তা ছিলেন, সেইরূপে গৌড়ে সরকার ঠাকুর সকলের পূজ্য ও মান্য। সরকার ঠাকুর নানারূপে কাতর। প্রথম প্রভুর অদর্শনে তাহার পরে গদাধর গোস্বামীর অদর্শনে। তাহার পরে তাঁহার "প্রিয়াজী" অদর্শন হইলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে তিনি প্যারীজী অনুকরণ করিয়া প্রিয়াজী বলিতেন। আর তাহার পরে দাস গদাধর অপ্রকট হইলেন। সরকার ঠাকুর আর ধরাধামে রহিলেন না। ঠাকুর ঘরে গমন করিয়া সরকার ঠাকুর কিরূপে অদর্শন হইলেন, কেহ বলিতে পারেন না। ঠাকুর মহাশয় আসিলে সরকার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও মুকুন্দের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন তাঁহার হাত ধরিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, আর ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

সরকার ঠাকুর, তাঁহার ভজন-গৃহে শ্রীগৌর-বিগ্রহ সম্মুখে রাখিয়া দিবা নিশি যাপন করিতেন। সেই ঘরের নিকটে গমন করিয়া ঠাকুর মহাশয় রোদন করিতে লাগিলেন।

সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-পার্ষদ। তাঁহার নিকট বসিয়া রঘুনাথ কেবল অহরহঃ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা কথা শুনিতেন। শ্রীনরহরি নবদ্বীপে প্রভুর সমুদয় লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। অতি শিশু সন্তান যেরূপ স্তন্য দুগ্ধ পান করে, সেইরূপ প্রভুর শিশু কাল হইতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা-সুধা, রঘুনন্দন ঠাকুর তাঁহার নিকট পান করিতেন। রঘুনন্দন যাহা সরকার ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কাহিনী, জগন্নাথ মিশ্রের কাহিনী, শচী দেবীর কাহিনী বিশ্বরূপের কাহিনী, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কাহিনী, ভক্তগণের কাহিনী, রঘুনন্দনের মুখে ঠাকুর মহাশয় পিপাসাতুর চাতকের ন্যায় শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এই শ্রীখণ্ডে প্রথম ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার

যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহাতে ঐরূপ বিগ্রহ সেবা করিবার নিমিত্ত তাঁহার গাঢ় বাসনা উপস্থিত হইল।

সেখান হইতে জাজিগ্রাম শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বাড়ী অতি নিকট। এখন জাজিগ্রামে আচার্য্য প্রভুর সমাধি ব্যতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু আচার্য্য প্রভুর প্রভাবে তখন জাজিগ্রাম সমস্ত গৌড়ে বিখ্যাত ছিল। একখানি কৌপিন পরিধান করিয়া আচার্য্য প্রভু গৌড়ে আগমন করিয়াছেন। এখন তিনি শত শত দেশের শীর্ষস্থানীয় গণের ভব-সাগর পারের একমাত্র কর্ত্তা! কিন্তু ঠাকুর মহাশয় শুনিলেন তিনি বনবিষ্ণুপুরে আছেন। সুতরাং শ্রীখণ্ড হইতে তিনি জাজিগ্রামে না যাইয়া কাটোয়ায় গমন করিলেন। এখানে গদাধর দাস বাস করিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি তখন অপ্রকট হইয়াছেন, যত দিবস শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রকট ছিলেন তত দিবস গদাধর নবদ্বীপে ছিলেন। তাঁহার অদর্শনে গদাধর দাস আর নবদ্বীপে তিষ্ঠাইতে না পারিয়া কাটোয়ায় আসিয়া শ্রীগৌর-বিগ্রহ স্থাপন করিয়া বাস করিলেন। সে বিগ্রহ অদ্যাপি আছেন। তাঁহার শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী তখন সেই সেবার অধিকারী। তিনি ঠাকুর মহাশয়কে অত্যন্ত আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন।

কাটোয়া বৈষ্ণবগণের অতি পবিত্র স্থান। যে স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ ভারতী গোস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন সে স্থান অতি যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। সেখানে বৈষ্ণব মাত্রে একবার গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবন মোহন কেশ মুণ্ডিত হয়। সেই কেশের সমাধি আছেন। জগতে শ্রীগৌরাঙ্গের সেই কেশ গুলি মাত্র নিদর্শন আছেন। প্রভু কিরূপে অপ্রকট হয়েন কেহ বলিতে পারেন না। সেই কেশগুলি মৃত্তিকার মধ্যে আছেন, তাঁহার ভক্তগণ ইহাই ভাবিয়া

সে স্থান অশ্রুজলে বিসর্জ্জন করেন। কাটোয়ায় আসিয়া ঠাকুর মহাশয়ের নীলাচলের শোক উদ্দীপিত হইল। প্রভুর সন্ন্যাসের স্থানের ধূলি মাখিলেন, আর অধীর হইয়া সেখানে পড়িয়া থাকিলেন।

যদুনন্দন তাঁহাকে অনেক প্রবোধ করিয়া উঠাইয়া অন্যান্য স্থান দেখাইলেন। যে ভারতী শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস মন্ত্র দেন তাঁহার সমাধি রহিয়াছে। হরিদাস নামক যে প্রামাণিক প্রভুর মস্তক মুণ্ডন করেন, তাঁহারও সমাধি রহিয়াছে। প্রভুর মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া তিনি ও তাঁহার বংশীয়েরা বিখ্যাত। সেই প্রামাণিকের বংশধরেরা কাটোয়ায় বাস করেন। তাঁহারা স্বীয় বৃত্তি করেন না। তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ প্রভুর মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন, সেই গৌরবে তাঁহারা ক্ষৌর কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয় এই দুই সমাধি প্রণাম করিলেন। এখানে সেই নাপিতের প্রভুর মস্তক মুণ্ডন কার্য্য প্রাচীন পদে কিরূপ বর্ণিত আছে, তাহা লিখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। যথা—

তখন নাপিত আসি, প্রভুর সম্মুখে বসি,
ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে।

* * *

মুণ্ডন করিতে কেশ, হৈল অতি ভাবাবেশ,
নাপিত কান্দয়ে উভরায়।
কি হৈল কি হৈল বলে, ক্ষুর আর নাহি চলে,
প্রাণ কাটি বিদরিয়া যায়॥ ইত্যাদি।

সেখান হইতে ঠাকুর মহাশয়, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান একচাকা গ্রামে গমন করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ বাল্যকালে উদাসীন হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন। সুতরাং একচাকায় শ্রীনিত্যানন্দের বাল্য লীলা

ব্যতীত আর কোন লীলার স্থান নহে। সেই সমুদয় দর্শন করিয়া ঠাকুর মহাশয় পদ্মাপার হইলেন। জন্মস্থান খেতরিতে উপস্থিত হইলে, গ্রাম সমেত সকলে আসিয়া আনন্দে প্রণাম ও হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। পিতা মাতা আইলেন, ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিলেন, মাতা পিতা আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা বলিলেন, "আমরা অতি বৃদ্ধ, তুমি এখন তীর্থ করিতে যাইও না, বাপ, আমরা মরিয়া গেলে তুমি যাইও। যে কয়েক দিন বাঁচি তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারি না।

ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "আমি তীর্থ করিতে যাই নাই। তীর্থ ইত্যাদি মনের ভ্রম। আমি প্রভু ও প্রভুগণের স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহা না দেখিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিতাম না, তাহা আমার দেখা হইয়াছে। আমি আপনাদের দুঃখ দিয়া আর যাইব না। আমি এখানে থাকিয়া যত দূর পারি ভজন সাধন করিব।"

আবার খেতরি।

সংসারে বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া যে কঠোর ভজন সাধন করা যায়, ইহার উদাহরণ স্থল ঠাকুর মহাশয় হইলেন। ইনি রাজার ছেলে, পিতা রাজা, মাতা রাণী, উভয়ে বর্ত্তমান। রাজধানী তাঁহার বাসস্থান। এরূপ স্থলে থাকিয়া বিষয় হইতে অন্তর থাকা অতি কঠিন, এক প্রকার অসম্ভব। ঠাকুর মহাশয় তাহাই করিলেন।

ঠাকুর মহাশয়ের নূতন যৌবন। দারপরিগ্রহ করিলেন না। যাঁহারা এরূপ ব্রহ্মচর্য্য লয়েন তাঁহারা সমাজের প্রলোভনের মধ্যে না থাকিয়া বনে বাস করেন। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় গৃহে রহিলেন নিজ গ্রামে রহিলেন, তবু তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারিল না। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন যে, সেরূপ কঠিন ব্রত কেবল গৌরাঙ্গভক্তগণেই পালন করিতে পারেন, কারণ তাঁহাদের নিকট ইন্দ্রিয়গণ, দন্তোৎপাটিত সর্পের ন্যায়, তাঁহাদের খেলার বস্তু, প্রাণঘাতক নহে।*

ঠাকুর মহাশয় উদাসীন হইলে, তাঁহার খুল্লতাত পুরুষোত্তম দত্তের তনয় সন্তোষ দত্ত যুবরাজ হইলেন। এই সন্তোষ দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্র ভিক্ষা চাইলেন ও পাইলেন। তাহার পর বলরাম মিশ্র মন্ত্র লইলেন। বলরাম মিশ্র ব্রাহ্মণ আর ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ, সুতরাং ব্রাহ্মণগণ ইহাতে নিতান্ত কুপিত হইলেন ও দেশের মধ্যে নানা মত সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। কিন্তু গ্রাহ্য করিলেন না।

ঠাকুর মহাশয় শ্রীখণ্ডে যখন শ্রীশ্রীগৌর- বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল মূর্ত্তি দেখেন তখনি তাঁহার ঐরূপ যুগল মূর্ত্তি স্থাপন করিতে প্রবল বাসনা হয়।

নরোত্তম বিলাস গ্রন্থ বলেন যে, ঠাকুর মহাশয় স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁহার কোন এক গৃহস্থ প্রজার গোলার মধ্যে এইরূপ মূর্ত্তি আছেন। এই স্বপ্নে দেখিয়া তিনি বহুতর লোক সমভিব্যাহারে যাইয়া সেই গোলা হইতে যুগল বিগ্রহ বাহির করেন। কিন্তু প্রেমবিলাস বলেন, তিনি কারিকর আনিয়া অষ্ট ধাতু দ্বারা সেই মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন। যাঁহার যে কাহিনী বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি তাহা করিবেন। আমারা শেষেরটিই বিশ্বাস করি। কারণ ঠাকুর মহাশয় যদি ধান্ত মধ্যে বিগ্রহ পাইতেন, তবে তাঁহাকে ঢোল বাজাইয়া লোক সমারোহ করিয়া আনিতেন না। তিনি গোপনেই আনিতেন, জাঁক জমক ইত্যাদি কিছুমাত্র জানিতেন না। সে যাহা হউক, সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এক মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইলেন; এই ঠাকুরের নাম "বল্লভী কান্ত"।

এ দিকে ঠাকুর মহাশয়ের যশঃ ক্রমে প্রচার হইতে লগিল। দিবানিশি ভজন করেন, আহার কেবল মাত্র অন্নের মণ্ড ও পরিত্যক্ত তরকারী। ইহার দ্বারাই তিনি জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। বিষয় কথা কি গ্রাম্য কথা বলেন না, শুনেন না। কথন ধ্যান, কথন স্মরণ, কথন লীলা আর কথন শিষ্যগণ লইয়া কীর্ত্তন করেন।

একদিন কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া নূতন একরূপ সুরে কীর্ত্তন করিলেন। সেরূপ কেহ কখন শুনে নাই। সেই কীর্ত্তন যেরূপ নূতন সেইরূপ মধুর। ইহা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গীগণ একেবারে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। "ঠাকুর মহাশয়ের কণ্ঠে যেন অমৃতের ধার" (নরোত্তম বিলাসে)। একে সুকণ্ঠ, তাহে হৃদয় দিবানিশি তরল, ঠাকুর মহাশয়ের সেই সুধাময় কীর্ত্তন শুনিবার জন্ম অবৈষ্ণবগণও আসিতে লাগিলেন। সেই কীর্ত্তন শুনিয়া কি বৈষ্ণব কি অবৈষ্ণব সকলেই মোহিত হইলেন।

এইরূপে "গরাণহাটি" কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। পরগণা গরাণহাটিতে সৃষ্টি হইল, এই নিমিত্ত ইহার নাম গরাণহাটি হইল। এইরূপে বেলেটী পরগণার আচার্য্য প্রভু যে কীর্ত্তন প্রচার করেন, তাহাকে বলে "বেলেটী"। মনোহরসাহী কীর্ত্তন মিত্র মহাশয়গণ সৃষ্ট করেন। এই গরাণহাটা পদ্ধতি সৃষ্টি হইলে ঠাকুর মহাশয় সেই সঙ্গে গীত রচনা করিতে লাগিলেন। এদিকে যেমন সুর সৃষ্টি হইতে লাগিল, তেমনি আবার নূতন নূতন তালও সৃষ্টি হইতে লাগিল। কথিত আছে, দেবী-দাস নীলাচলে গিয়া স্বরূপ দামোদরের নিকট বাদ্য শিখিয়া আইসেন। এইরূপে ক্রমে কয়েক জন বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া ও মৃদঙ্গ-বাদক শিক্ষিত হইলেন, যথা দেবীদাস, বল্লভদাস, গৌরাঙ্গদাস, গোকুলদাস, ইত্যাদি। ইঁহারা সকলেই গীত বাদ্য উভয়ে পটু তখন আর সমস্ত গৌড়ে তাঁহাদের ন্যায় কেহ ছিলেন না। ঠাকুর মহাশয় নির্জ্জনে একএকটি পদ করিয়া তাহাতে সুর বসাইতেন, পরে দেবী, গোকুল প্রভৃতিকে শুনাইতেন। তাঁহারা সকলে সেটী শিক্ষা করিতে করিতে ঠাকুর মহাশয় আবার নূতন পদ করিতেন। নূতন পদ নূতন সুর ও নূতন তাল সম্বলিত এই গরাণহাটি কীর্ত্তনের প্রশংসা সমস্ত গৌড়ে প্রচারিত হইল, কিন্তু খেতরি দূরদেশ বলিয়া কেহই শুনিতে পাইলেন না।

এ দিকে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল বিগ্রহ ও বল্লভীকান্ত স্থাপনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণ এই আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। দেশ উন্মত্ত হইল, আর বলা বাহুল্য যে, রাজা রাণীও উন্মত্ত হইলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ সঙ্কল্প করিলেন যে, এই বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে যে মহোৎসব করিবেন, তাঁহার ন্যায় কেহ কখন করিতে পারেন নাই। রাজা এই উপলক্ষে সর্ব্বস্ব ক্ষেপণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথি ফাল্গুন পূর্ণিমায় বিগ্রহ স্থাপন হইবে, এরূপ

স্থির হইল। তখনও তাহার দুই তিন মাস আছে, কিন্তু সেই তখন হইতেই আয়োজন আরম্ভ হইল। আমন্ত্রিত বৈষ্ণবগণকে বাসা দিবার নিমিত্ত সমস্ত গ্রামে ও নিকটস্থ সমস্ত পল্লীতে নূতন ঘর প্রস্তুত হইতে লাগিল। ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল, খোল করতালের বায়না দেওয়া হইল।

কিন্তু আচার্য্য প্রভু কোথা? তিনি না হইলে কে এ বৃহৎ কার্য্য সমাধা করে? ঠাকুর মহাশয় এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন যে, আচার্য্য প্রভু খেতরি হইতে চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে বুধুরি গ্রামে কোন কার্য্য উপলক্ষে আসিয়াছেন। তখনি তিনি, কয়েক জন শিষ্য সমভিব্যাহারে, বুধুরি চলিলেন। আচার্য্য প্রভু বুধুরি গোবিন্দ কবিরাজের বাড়ী আসিয়াছেন। এই গোবিন্দ কবিরাজ সেই পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস। ঠাকুর মহাশয় আসিতেছেন, এই সংবাদ তাঁহার এক জন শিষ্য অগ্রে গমন করিয়া আচার্য্য প্রভুকে দিলেন। আচার্য্য প্রভু আনন্দে মগ্ন হইয়া, ঠাকুর মহাশয়কে অগ্রবর্ত্তী হইয়া আনিবার জন্ত তাঁহার দুইজন শিষ্যকে পাঠাইলেন।

আচার্য্য প্রভুর প্রেরিত শিষ্যদ্বয় যাইয়া ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিলেন, এবং একজন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, ও আর একজন বাম হস্ত ধরিয়া আসিতে লাগিলেন। যিনি দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আসিতেছেন, তাঁহার নাম ব্যাসাচার্য্য। ইনি আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। ইনিই রাজা হাম্বীরের সভায় ভাগবত পড়িতেন, ও প্রথমে আচার্য্য প্রভুর সহিত কলহ করেন, আর বাম হস্ত যিনি ধরিয়া আসিতেছেন, তাঁহার নাম শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ। শ্রীখণ্ডের শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ চিরঞ্জীব সেন, বিখ্যাত কবি দামোদরের কন্যা বিবাহ করেন। সেই কন্যার পুত্র,—রামচন্দ্র ও গোবিন্দ। উভয়ে মাতামহ দ্বারা প্রতিপালিত। মাতামহ দামোদর

শাক্ত; রামচন্দ্র ও গোবিন্দ তাঁহাদের পিতা চিরঞ্জীবের বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শাক্ত হইলেন। রামচন্দ্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, মদনের ন্যায় রূপবান, চরিত্র নির্ম্মল। রামচন্দ্র, আচার্য্যপ্রভুর নিকট মন্ত্র লইলেন, লইয়া আবার পিতার ধর্ম্মে আসিলেন। কনিষ্ঠ গোবিন্দ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া দাদা রামচন্দ্রকে লিখিলেন যে, তিনি যেন আচার্য্য প্রভুকে লইয়া আইসেন, তাঁহার নিকট মৃত্যুর মন্ত্র লইবেন। রামচন্দ্র তখন জাজিগ্রামে ছিলেন, তিনি আচার্য্য প্রভুকে সঙ্গে লইয়া নিজ বাটী বুধুরি গ্রামে আসিলেন।

রামচন্দ্র, ঠাকুর মহাশয়ের বাম হস্ত ধরিয়া আনিতেছেন। উভয়ে আড়নয়নে দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর মহাশয় ভাবিতেছেন, এ ব্যক্তিটি কে? স্পর্শ করিয়া আমার এত আনন্দ অনুভব হইতেছে কেন? রামচন্দ্র ভাবিতেছেন, ঠাকুর মহাশয়ের নাম শুনিয়াছিলাম, শুধু ঠাকুর নন, ইনি যে কেবল মধুর! করে করে লিপ্ত, উভয়ে উভয়ের স্পর্শ সুখ অনুভব কতিতেছেন। ঠাকুর মহাশয় ভাবিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ কি আমাকে এই সঙ্গিটী মিলাইয়া দিবেন? রামচন্দ্র ভাবিতেছেন, আমি কি ঠাকুর মহাশয়ের চরণ-সেবা ও সঙ্গ পাইব?

ঠাকুর মহাশয়ের আচার্য্য প্রভুর সহিত বহু দিন পরে মিলন হইল। ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করিলেন, আচার্য্য প্রভু আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা বসিলেন, চতুঃপার্শ্বে শিষ্যগণ বসিলেন। পরস্পর পরস্পরের কাহিনী বলিতে লাগিলেন। সকলে দেহের চেষ্টা ভুলিয়া গেলেন। এমন সময় রামচন্দ্র, ঠাকুর মহাশয়কে স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কে স্নান করে, কে বা ভোজন করে,—কৃষ্ণ-কথায়, গৌর-কথায়, আনন্দে সকলে বিভোর। এইরূপে দিবা অতীত হইল, নিশিও গেল যখন ঠাকুর মহাশয় কথা বলেন, তখন রামচন্দ্র তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া

থাকেন। ঠাকুর মহাশয়ের সমুদয় কার্য্যই তাঁহার নিকট কেবল মধু। ঠাকুর মহাশয়েরও রামচন্দ্র সম্বন্ধে সেইরূপ ভাব। পর দিবস ঠাকুর মহাশয় শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও মহামহোৎসবের কথা তুলিলেন। তিনি তাঁহার পিতার ও অন্যান্য সকলের ইচ্ছা জানাইয়া বলিলেন যে, এই গৌড়ের সমস্ত বৈষ্ণবগণকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। আচার্য্য প্রভু শুনিয়া নিতান্ত সুখী হইলেন, হইয়া বলিলেন, "তুমি আপাতত ব্যাসাচার্য্যকে সঙ্গে করিয়া খেতরি গমন কর, আমি রামচন্দ্রকে লইয়া চারি পাঁচ দিবস পরে যাইতেছি।" তাহার পর সকলে বসিয়া মহান্তগণের নামের একটী ফর্দ্দ করিতে লাগিলেন।

সর্ব্ব প্রথমে শ্রীজাহ্নবা গোস্বামীর নাম লেখা হইল। তাহার পরে প্রভুর বীরভদ্রের, পরে শ্রীঅদ্বৈত তনয় শ্রীগোপাল মিশ্রের। এইরূপ তাঁহারা ক্রমান্বয়ে নাম লিখিতে লাগিলেন। রাঢ়ে বঙ্গে, বারেন্দ্রে, উৎকলে, যেখানে যেখানে মহাপ্রভুর ভক্তগণ আছেন, সকলেরই নাম লেখা হইল, এবং কিরূপ পত্র লেখা হইবে, তাহার মুসবিধাও সংস্কৃত পদ্যে করা হইল। পত্রে লেখা থাকিল যে, সকলের নাম না জানায় লেখা হইল না, কিন্তু আমন্ত্রিত মহান্ত ও তাঁহার গণ গৌরাঙ্গভক্ত মাত্রকেই সঙ্গে আনিবেন।

তখনি সেই বুধুরি গ্রামে বসিয়া বহুতর পত্র লেখা হইল। আর সেখান হইতে রাঢ়ের সর্ব্বস্থানে ও উৎকলে লোক দ্বারা পত্র বিলি আরম্ভ হইল। ঠাকুর মহাশয় ব্যাসাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া খেতরি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের গমনকালে রামচন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, উভয়ের নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল, কেহ কাহাকে ছাড়িতে চাহেন না।

———

মহোৎসবের উদ্যোগ

আচার্য্য প্রভু তাহার কয়েক দিন পরেই খেতরি পঁহুছিলেন। সঙ্গে রামচন্দ্র, গোবিন্দ ও অন্যান্য শিষ্যগণ ছিলেন। শ্রীগোবিন্দ মরিবেন জানিয়া মন্ত্র গ্রহণ করেন, কিন্তু মন্ত্রের শক্তিতে বাঁচিয়া উঠিলেন। যদিও কার্য্য ঠাকুর মহাশয়ের, কিন্তু সমুদয় ভার আচার্য্য প্রভুর উপরে পড়িল। কারণ তিনিই কর্ত্তা। যখন যে কোন উৎসব হইত, তাহাতেই আচার্য্য প্রভু কর্ত্তৃত্ব করিতেন। আবার ঠাকুর মহাশয় চিরকালই বালক, উৎসবের কি প্রয়োজন অপ্রয়োজন তাহা তিনি কি জানেন? আচার্য্য প্রভুর মনে অত্যন্ত দুর্ভাবনা হইল যে, এইরূপ মহোৎসব সুসিদ্ধ হইবে কি না। খেতরি পদ্মাপার, বারেন্দ্র-ভূমিতে। এইরূপ দূরদেশে, অজানিত স্থানে, মহান্তগণ কি আসিবেন?

কিন্তু ভগবানের কি ইচ্ছা বলা যায় না। এই মহোৎসবের সংবাদ খেতরিতে উৎপন্ন, হইয়া দাবানলের ন্যায় দ্রুতবেগে চতুর্দ্দিকে চলিল। যিনি মহোৎসবের কথা শ্রবণ করেন, তিনিই বলিয়া উঠেন, "আমি যাইব।" পিপীলিকা সারির ন্যায় মহান্ত বৈষ্ণবগণ খেতরি আসিতে লাগিলেন।

এ দিকে খেতরিতে শুক্লা-পঞ্চমী হইতে বাদ্য আরম্ভ হইল। গ্রামের ও নিকটস্থ সমুদয় গ্রামের লোক, রাজার সমুদয় ভৃত্য, সকলে একেবারে উৎসবের আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। নূতন নূতন গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে ও প্রত্যেক গৃহে একটি করিয়া ভাণ্ডার করা হইয়াছে, যাহাতে মহান্তগণ

আসিয়া আর কোন কষ্ট না পান। দেশের যত বাস্তকর ক্রমে আসিতে লাগিল। কথা কি নিমন্ত্রণ কাহারও নাই, অথচ সকলের নিমন্ত্রণ। যেন কুরুক্ষেত্রের যজ্ঞ। যিনি আসিতেছেন, তিনিই অন্ন পাইতেছেন। সমস্ত পথে কদলী ও মঙ্গলঘট রাখা হইয়াছে। যথা, নরোত্তম বিলাসে :—

স্থানে স্থানে কদলী বৃক্ষের নাহি লেখা।
নারিকেল কদলী বেষ্টিত আম্রশাখা॥

মহান্তগণকে পার করিবার নিমিত্ত ঘাটে বহুতর নৌকাও রাখা হইয়াছে।

মহান্তগণ যেমন আসিতেছে অমনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে আনিয়া বাসা দেওয়া হইতেছে, ও তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত এক জন লোক নিযুক্ত হইতেছেন। এইরূপে জাহ্নবা গোস্বামীর সহিত বহুতর লোক আসিলেন, যথা—শ্রীচৈতন্য ভাগবত-প্রণেতা শ্রীবৃন্দাবন দাস পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস ও বলরাম দাস, ইত্যাদি ইত্যাদি। রামচন্দ্র কবিরাজ ইঁহাদের তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন।

শ্যামানন্দ পূর্ব্বেই রসিক মুরারি প্রভৃতি শিষ্যগণ সঙ্গে করিয়া আগমন করিয়াছেন। শ্যামানন্দ, কি আচার্য্য প্রভু, কি তাঁহাদের গণ, নিমন্ত্রিতের মধ্যে গণ্য নহেন। ইঁহাদের নিজ বাড়ী, ইঁহারা সকলে কর্ম্মের ভাগ-যোগ করিয়া লইলেন। শান্তিপুর হইতে প্রভু গোপাল প্রভৃতি গণ সহ আগমন করিলেন। শ্যামানন্দের গুরু, হৃদয়-চৈতন্য, বহু শিষ্য সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তাঁহার ও তাঁহার গণের ভার শ্যামানন্দ লইলেন। পূর্ব্বে যেমন শুনা যাইত যে, অমুক মুনি দশ সহস্র শিষ্য অমুক পাঁচ সহস্র শিষ্য লইয়া আইলেন, সেইরূপ রঙ্গ হইতে লাগিল। যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা ভাণ্ডারে কিছু কিছু রাখি-

তেছেন, অর্থাৎ লৌকিকতা দিতেছেন, এইরূপে কেহ বস্ত্র, কেহ রৌপ্য কেহ স্বর্ণ, ইত্যাদি আনিয়াছেন।

নবদ্বীপ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ ও শ্রীবাসের ভ্রাতা, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি আসিলেন, তাঁহাদের সেবার ভার আচার্য্য লইলেন। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন, কানাই ঠাকুর প্রভৃতি বহু লোক আসিলেন, তাঁহাদের সেবার ভার শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ লইলেন। কাটোয়ার যদুনন্দন, আকাইহাটের কীর্ত্তনীয়া কৃষ্ণ দাস, বংশীবদনের পুত্র চৈতন্য দাস, খঞ্জ ভগবানের পুত্র আচার্য্য প্রভৃতি যেখানে যত মহান্ত বাস করেন, সমস্তই খেতরিতে আগমন করিলেন।

এইরূপে সহস্র সহস্র মহান্ত গণসহ আসিলে, কত সহস্র লোকে নিকটস্থ ও দূরস্থ গ্রাম সকল হইতে উৎসব দর্শন করিতে আসিল। খেতরি গ্রাম ও নিকটস্থ সমুদয় গ্রাম লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

এদিকে শত শত নূতন মৃদঙ্গ, সহস্র সহস্র করতাল, কত শঙ্খ, কত ঘণ্টা সংগ্রহ হইয়াছে। অহোরহ কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শত শত সম্প্রদায়ে "জয় গৌরাঙ্গ" "জয় নিত্যানন্দ" বলিয়া স্থানে স্থানে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দের কীর্ত্তনীয়া দল সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারা এই পদ গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যথা :—

"বল ভাই হরি ও রাম হরি ও রাম।
এই মতে নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥"

যেমন কল্‌কল্ করিয়া বান ডাকিয়া আসিতে থাকে, সেইরূপ একেবারে খেতরি গ্রামে প্রেমসিন্ধু উথলিয়া পড়িল। আপামর সাধারণ সকলে উন্মত্ত হইল। যে যখন কৃষ্ণনাম মুখে আনে নাই, সেও সেই তরঙ্গে পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সাধারণ লোকের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন প্রেমধনসম্পন্ন মহান্তগণের কি ভাব হইল, তাহা কেবল

অনুভব করা যাইতে পারে। একে সাধু সঙ্গ ও পরস্পর মিলন, তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব ; মহান্তগণ সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, যেন তাঁহারা গোলকধামে আসিয়াছেন।

সকল বিষয়ের কর্ত্তা আচার্য্য প্রভু। বিগ্রহ স্থাপনের ভার তাঁহার উপর। আচার্য্য প্রভু যথাবিধি ঠাকুরদ্বয়কে, অর্থাৎ যুগল গৌরাঙ্গ ও বল্লভীকান্তকে, অভিষেক করিলেন। শাস্ত্র বিধি অনুসারে ক্রমে ক্রমে আচার্য্য প্রভু সমুদয় কার্য্য করিতে থাকিলেন। বৃহৎ বৃহৎ চন্দ্রাতপের নিচে ঠাকুরের আঙ্গিনায় মহান্তগণ বসিয়া আছেন। তাঁহারা প্রাতঃস্নান করিয়া কৃষ্ণানন্দ রাজার দত্ত নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। সকলে চন্দনে লিপ্ত ও ফুলের মালায় সুশোভিত। চারি দিকে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতেছে যথা, ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে :—

কি অপূর্ব্ব চন্দ্রাতাপ, অঙ্গন আবৃত।
কত শত কদলী বৃক্ষাদি সুশোভিত।।
কেহ কেহ পুষ্পমালা প্রস্তুত কারণে।
কেহ বহু লোক যুক্ত চন্দন ঘর্ষণে।।
কেহ কেহ নানা বাদ্য বাদক নর্ত্তক।
বহু দেশ হইতে আইল অনেক গায়ক।

শ্রীবিগ্রহগণ সিংহাসনে বসিলে সংকীর্ত্তনের আজ্ঞা হইল। ঠাকুর রঘুনন্দন মহাশয়কে চন্দন মাখাইলেন ও গলায় মালা দিলেন, এবং সংকীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন ঠাকুর মহাশয় দেবীদাসকে সংকীর্ত্তনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে বলিলেন। রাশীকৃত খোল করতাল পড়িয়া রহিয়াছে। খোল করতাল পূজা করা হইল। খোলে খোলে মিল করা হইল। ঠাকুর মহাশয় তখন নিজ হস্তে তাঁহার শিষ্যগণকে মালা ও চন্দন অর্পণ করিলেন। তাঁহারা সকলে সারি দিয়া শ্রীবিগ্রহের

সম্মুখে দাঁড়াইলেন। মধ্যস্থলে করতাল-হস্তে ঠাকুর মহাশয় দাঁড়াই- লেন। পরাণহাটী কীর্ত্তন ঠাকুর মহাশয়ের সৃষ্টি, ইহা কেহ কখন শুনেন নাই। ঠাকুর মহাশয় গৌরাঙ্গের বরপুত্র, তাঁহার প্রেমভাব কেহ দেখেন নাই। কীৰ্ত্তনে ঠাকুর মহাশয় অদ্বিতীয়, তাঁহার কীৰ্ত্তন কেহ শুনেন নাই। সুতরাং সকলে তাঁহার মুখের প্রতি চিত্র পুত্তলি- কার মত চাহিয়া রহিলেন। টু শব্দটী নাই, কিন্তু তবু সকলের হৃদয় টলমল করিতেছে। সকলেই ঠাকুর মহাশয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া তাঁহার মুখের ভাব দেখিতেছেন। "নরোত্তম বিলাস" গ্রন্থ বলিতেছেন যে, ঠাকুর মহাশয় দেবীদাসকে সুসজ্জিভূত হইতে আজ্ঞা করিয়া, গৌরাঙ্গ দাস, বল্লভ দাস, গোকুল দাস, প্রভৃতি প্রিয় জন লইয়া,

দাঁড়াইল প্রাঙ্গনেতে পরম তেজোময় ॥

* * * *

পুলকে বেষ্টিত অঙ্গ বলনী সুন্দর।
কনক কেতকী জিনি কান্তি মনোহর।

এই সম্বন্ধে ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

সকল মহান্ত প্রিয় নরোত্তম অতি।
সংকীৰ্ত্তন আরম্ভে দিলেন অনুমতি ॥
নরোত্তম সবে প্রণময়ে মহীতলে।
সংকীর্ত্তনারম্ভে হিয়া আনন্দে উথলে ॥
দীন প্রায় দাঁড়াইয়া প্রভুর প্রাঙ্গনে।
কৃপা দৃষ্টে চাহে নিজ পরিকর পানে ॥

ঠাকুর মহাশয় বিগ্রহগণ পানে চাহিয়া কৃপা মাগিতেছেন, আর মধুর হাসিয়া, নিজ গণ পানে চাহিয়া, উৎসাহ দিতেছেন। পরে ভূমে লোটা-

ইয়া মহান্তগণকে প্রণাম করিয়া, করতাল হাতে লইয়া দাঁড়াইলেন; বাদ্য আরম্ভ হইল, যথা নরোত্তম বিলাসে :—

শ্রীগৌরাঙ্গ দাস তাল পট আরম্ভয়ে।
প্রথমেই মন্দ মন্দ বাদ্য আরম্ভয়ে॥
তদুপরি নব্য নব্য বৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে।
অমৃত অঙ্কুর যৈছে বাড়ে ঘনে ঘনে॥
অশ্রুত অদ্ভুত বাদ্য শুনি দেবগণ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সহ ব্যাপিল গগন॥
এথা সর্ব্ব মহান্ত কহয়ে পরস্পরে।
প্রভুর অদ্ভুত সৃষ্টি নরোত্তম দ্বারে॥
হেন প্রেমময় বাদ্য কভু না শুনিনু।

তাহার পর আলাপ আরম্ভ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ দাস অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ পৃথক পৃথক দেখাইয়া আলাপ করিতেছেন। আবার গোকুল কি বলিতেছেন :—

অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদদ্বয়ে।
অনিবদ্ধ গীতে গোকুলাদি আলাপয়ে॥
অনিবদ্ধ গীত বর্ণালাপ স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ॥

*   *   *   *

নরোত্তম বেষ্টিত এ সব পরিকরে।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্র শোভা করে॥

গোকুল দাসের আলাপ সাঙ্গ হইলে ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। যথা :—

বার বার প্রণময়ে সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট কারণে॥
রাগিণী সহিত রাগ মূর্ত্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা॥
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরম মাদক সুধা নহে তার সম॥

ঠাকুর মহাশয় করতাল লইয়া শ্রীবিগ্রহ পানে চাহিয়া আলাপ করিতেছেন। কণ্ঠ কি অমৃত না মধু! একে এইরূপ কণ্ঠ তাহাতে প্রেমে উহা নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে।* ঠাকুর মহাশয়ের সংকীর্ত্তন সময়ের ছবি স্তবামৃত লহরীতে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা :—

সংকীর্ত্তনানন্দজমন্দহাস্য
দন্তদ্যুতিদ্যোতিতদিঙ্মুখায়।
স্বেদাশ্রুধারাস্নপিতায়তস্মৈ।
নমোনমঃ শ্রীলনরোত্তমায়॥

ঠাকুর মহাশয় আলাপ করিতেছেন ও মধুর হাসিতেছেন, আবার নয়ন দিয়া আনন্দ অশ্রু পড়িতেছে। আলাপ সাঙ্গ হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের স্তব-কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। যেই কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, অমনি রসের তরঙ্গ উঠিল। এই কীর্ত্তনানন্দে শ্রীগৌরাঙ্গের গণ ও প্রধান প্রধান মহান্তগণ উপস্থিত; এতগুলি সুঘটনে যে অদ্ভুত তরঙ্গ উঠিবে তাহাতে আর কথা কি? তাহাতে অদ্ভুত কীর্ত্তন, অদ্ভুত কীর্ত্তনীয়া! সকল মহান্ত বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে তাহা শুনিয়া মহান্তগণ কি বলিতেছেন, যথা ভক্তিরত্নাকরে :—

* যখন হৃদয়ে একবিন্দু প্রেমের উদয় হয়, তখন যাহার স্বর কর্কশ, তাহারও সুমধুর হয়। আর যাহার স্বাভাবিক মধুর স্বর, তাহার ত কথাই নাই।

কেহ কহে মহাপ্রভু স্বরূপের স্থানে।
শুনিতেন উচ্চগীত মহা হর্ষ মনে॥
গীত প্রথা রক্ষা ক্ষোপ নিবৃত্তি নিমিত্তে।
প্রচারিতে সম্যক বিচার কৈল চিতে॥
সে সময় তাহা প্রেম-সম্পুটে রাখিল।
নরোত্তম দ্বারে প্রভু এবে উঘাড়িল॥

সকল দিন গান সমান জমে না, কীর্ত্তনও সেইরূপ। কেন এরূপ হয়, কেহ ঠিক বলিতে পারেন না। কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে ক্রমে হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ উঠে, এই তরঙ্গ যদি ক্রমে বাড়িতে থাকিল, তবেই কীর্ত্তন জমিল। ক্রমে আনন্দের হিল্লোলে লোকের ধৈর্য্য, জ্ঞান, দেহ ধর্ম্ম, লজ্জা ভয় অন্তর্হিত হয়। আনন্দের লক্ষণের স্বরূপ অনেক ভাবের উদয় হয়,—মূর্চ্ছা (যাহাকে দশা বলে) হয়, কম্প হয়, জাড্য হয়, আবার আনন্দাশ্রুতে নয়ন ভাসিয়া যায়। যাঁহারা কীর্ত্তনে নৃত্য করেন, তাঁহারা নৃত্য করিয়া আনন্দ ভোগ করেন না, তাঁহাদের আনন্দে নৃত্য আপনি আইসে। লোকে বলে, "আহ্লাদে নাচিতে লাগিল।" তাই কীর্ত্তনে লোকে আনন্দে নৃত্য করে। এইরূপ কীর্ত্তন জমিয়া গেলে বাহ্য জগত প্রায় অন্তর্হিত হয়, শরীরও অবশ হয়, এমন কি মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলে অঙ্গে ব্যথা লাগে না। নরোত্তমের কীর্ত্তন শুনিয়া সহস্র সহস্র ভক্ত আনন্দে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন, হইয়া যাঁহার যেরূপ অভিরুচি, তিনি সেইরূপ করিতে লাগিলেন। শেষে সাধু ও অসাধু সকলে মিলিয়া গেলেন। বহুতর লোক নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন আর বড় একটা কাহার জ্ঞান রহিল না। কেহ অচেতন হইয়াছেন, কেহ গড়াগড়ি দিতেছেন, কেহ কেহ আবার কাহার গলা ধরিয়া রোদন করিতেছেন। এমন সময়, এক অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল। যথা নরোত্তম বিলাসে:—

নরোত্তম মত্ত হইয়া গৌর গুণ গায়।
গণ সহ অধৈর্য্য হইল গৌর-রায়॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত্য শ্রীবাস গদাধর।
মুরারী স্বরূপ হরিদাস বক্রেশ্বর॥
জগদীশ গৌরদাস আদি সবে লয়ে।
হইল সর্ব্ব নয়ন গোচর হর্ষ হয়ে॥
সবে আত্ম বিস্মৃত হইল সেই কালে।
যেন নবদ্বীপে বিলসয়ে কুতুহলে॥

তাঁহাদের বাহ্য ইন্দ্রিয় ধ্বংস হওয়ায় অন্তরেন্দ্রিয় প্রস্ফুটিত হইল। এইরূপ হইলে দিব্য চক্ষু লাভ হয়, তখন অদ্ভুত দেখিবার শক্তি হইয়া থাকে। উপস্থিত সকলে দেখিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ গণ সহ নৃত্য করিতেছেন। তাঁহাদের তখন মনে হইল যে, এই শ্রীনবদ্বীপ, তাঁহারা শ্রীনবদ্বীপে প্রভুর গণ সহ নৃত্য করিতেছেন। শেষে এরূপ হইল যে, মহান্তগণ ও গৌরাঙ্গের গণ একেবারে মিশিয়া গেলেন, পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে লাগিলেন। কেহ বা শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রে, এবং কেহ বা নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। তাঁহারা যে বহুকাল অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, এ জ্ঞান তখন আর রহিল না। তখন তাঁহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়া একেবারে উন্মত্ত হইলেন। কিন্তু মনুষ্য অতি দুর্ব্বল, এরূপ আনন্দ বহুক্ষণ ভোগ করিবার শক্তি ধরে না। তাই অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই গোলকের সে সুখ ফুরাইয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ গণ সহ যেমন হঠাৎ আসিলেন, অমনি হঠাৎ অদর্শন হইলেন!

তখন সকলেরই চেতন লইল, ও "কি হইল" "কি হইল" "কি দেখিলাম" বলিয়া কেহ রোদন করিতে, কেহ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কেহ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কেহ বা অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কীর্ত্তনে সাধু অসাধু সকলে মিশিয়া গিয়াছেন ও তরঙ্গে সকলেই ডুবিয়াছেন, সুতরাং সহস্র সহস্র লোক, কে কোথা কি করিতেছেন, কে তাহার তল্লাস রাখেন? এরূপ অদ্ভুত প্রকাণ্ড ব্যাপার শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকটের পরে কেহ কখন দেখেন নাই।

রাজা কৃষ্ণানন্দও সংকীর্ত্তনে মিশিয়াছেন। তিনি করিতেছেন কি না, এক একবার গৃহে গমন করিতেছেন, আর সম্মুখে যাহা পাইতেছেন, দৌড়িয়া তাহাই আনিয়া সংকীর্ত্তনের মাঝে বিলাইতেছেন। কেহ লয় বা না লয় তাহা দেখিতেছেন না; দেখিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। এইরূপে একটী দ্রব্য ফেলিয়া আবার অন্য দ্রব্য আনিতে দৌড়াইতেছেন। যথা প্রেম-বিলাসে:—

রাজা তখন কীর্ত্তনে লাগিল সব দিতে।
ঘর হইতে আনিছেন যে পড়য়ে হাতে॥
ঠাকুর মহাশয় তাহা কিছু নাহি জানে।

আবার বৃদ্ধ রাজা কি করিতেছেন,—না, পাত্র মিত্র লইয়া কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন। যথা:—

কৃষ্ণানন্দ মজুমদার স্বগণ সহিতে।
সঘনে পড়য়ে ভূমে কাঁপিছে কাঁপিতে॥
হেন দশা হইল দেয় সুখের সাঁতার।
লোটাইয়া কান্দে পায়ে ধরিয়া সবার॥

আবার রাজা এক কাণ্ড করিতেছেন। যথা:—

ক্ষণে ক্ষণে নরোত্তমের চাহে মুখপানে।
কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে ধরিয়া চরণে॥
পবিত্র করিলে বাপা স্বগণ সহিতে।
হেন সুখ কে দেখিল জন্মি পৃথিবীতে॥

পিতা নরোত্তমের চিবুক ধরিয়া বলিতেছেন, "ধন্য তুমি বাপ!" আবার পুত্রের পায় ধরিতেছেন, কিন্তু তাহাতে নরোত্তমের কি? তাঁহার বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা যত রঙ্গ করিতেছেন, তাহার কিছুই তিনি অবগত নহেন। তাঁহার অবস্থার আরো কথা বলিতেছি।

মহান্তগণ সকলেই ক্রমে ক্রমে স্থির হইলেন, কেবল ঠাকুর মহাশয়ের চৈতন্য হইল না। তাহাতে তাঁহার পিতা ও মহান্তগণ সকলে একটু ব্যস্ত হইলেন। ঠাকুর মহাশয়ের তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা আমি করিব না, প্রেমবিলাস হইতে উদ্ধৃত করিয়াই দেখাইতেছি। যথা:—

ঠাকুর মহাশয় শুনেন স্তব্ধ প্রায়।
কি জাতীয় প্রেম তাহা কহনে না যায়॥
শুনিতে শুনিতে মুখে হাসে খল খল।
নয়নে বহয়ে নীর কিবা অনর্গল॥
না রহিল ধৈর্য্য তবে নাচয়ে কীর্ত্তনে।
কম্প ঝম্প দেখি লোক ধরে দশজনে॥
প্রেমাবেশে ফিরিয়া নেহারে যার পানে।
সেই সব লোক কান্দি পড়য়ে চরণে॥
আচার্য্য ঠাকুর কান্দি করিলেন কোলে।
দুই ভুজ ধরি মন্দ মন্দ করি বোলে॥
প্রেম-মূর্ত্তি প্রেমময় করিলা ভুবন।
দেখিয়া আনন্দ-চিত্ত সফল নয়ন॥
হেন মহোৎসব করে হেন কার বল।
সগোষ্ঠি সহিত গৌর করুণা করিল॥

* * *

ঠাকুর মহাশয়ের নৃত্য দ্বিতীয় প্রহর।
ভাবের প্রহারে তনু হইল জর্জ্জর॥
শত শত আছাড় খায় ধরণী উপরে।
কাহার শকতি তারে ধরি রাখিবারে॥
মাতা পিতা পরিজন কান্দিয়া সকল।
নরোত্তম ধরি রাখে জীবন বিকল॥
দেখিয়া আচার্য্য ঠাকুর ভাবিত অন্তর।
বসিলা ধরিয়া তারে কাঁপে থর থর॥
উজ্জ্বলের শ্লোক পড়ে শ্রীরূপের বর্ণন।
যাহা হইতে ধৈর্য্য ধরে রাধিকার মন॥
পুন পুন শ্লোক পড়ে তবু বাহ্য নাই।
উপায় স্ফুরিল মনে লও অন্য ঠাই॥
শোয়াইল ঘরে লয়ে প্রহরেক অন্তে।
বাহ্য হৈল ভাবান্তর বৈসে সেই মতে॥

ঠাকুর মহাশয় বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। সকলে মহাপ্রসাদ ভোজনে বসিলেন। মুহুর্মুহু হরিধ্বনির সহিত সকলে ভোজন করিয়া উঠিলেন, তার পরে সহস্র সহস্র লোকে ভোজনে বসিলেন। মহোৎসব সাঙ্গ হইল, আর দুই এক দিবস পরে সকলে ক্রমে ক্রমে বিদায় হইলেন। জাহ্নবা গোস্বামী ঐ খেতরির পথে বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। সকল মহান্তকেই যথোচিত পূজা করা হইল, ও পাথেয় দেওয়া হইল। নূতন বস্ত্র, জলপাত্র, রৌপ্য মুদ্রা, স্বর্ণ মুদ্রা যাঁহার যেরূপ মর্য্যাদা, তিনি সেই-রূপ পাইলেন। পরস্পর বিদায় কালীন বড় দুঃখের উদয় হইল। সকলে ঠাকুর মহাশয়কে প্রবোধ দিয়া, খেতরি ত্যাগ করিলেন। থাকিলেন কেবল আচার্য্য প্রভু ও তাঁহার গণ।

এই মহোৎসবে সমস্ত গৌড় পবিত্র হইল, এবং ইহার সংবাদ বৃন্দাবন পর্য্যন্তও গেল। ইহাতে ঠাকুর মহাশয়ের অসভ্য দেশ ভক্তিময় হইল, এবং গৌড়ে ঠাকুর মহাশয়ের যশঃ প্রচারিত হইল। এই মহোৎসবের কথা অদ্যাপি আছে, আর চিরকাল থাকিবে। আচার্য্য প্রভুর নিমিত্ত একখানি পৃথক গৃহ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। আচার্য্য প্রভু আসিলে কেবলমাত্র তিনি সেখানে থাকিতেন। তিনি গমন করিলে ঘর বন্ধ থাকিত। আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র দিবানিশি কৃষ্ণ-কথায় থাকিলেন। এইরূপ একমাস থাকিয়া আচার্য্য প্রভু যাইতে অনুমতি চাহিলেন। ঠাকুর মহাশয় ইহাতে এত কাতর হইলেন যে, আচার্য্য প্রভু যাইতে পারিলেন না, আরও কয়েক দিবস রহিলেন।

আচার্য্য প্রভু গমন করিলে, ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র দুই জনে রহিলেন, ও দুই জনের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। একত্রে বাস, একত্রে শয়ন, একত্রে ভোজন, একত্রে স্নান, ও একত্রে ভজন,—তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নাই। তাঁহারা নিশিতে চারি দণ্ড মাত্র নিদ্রা যান, প্রভাতে উঠিয়া ঠাকুরের আরতি দর্শন করিয়া প্রাতঃক্রিয়া করেন, এবং স্নানান্তে ভজন কুটিরে গমন করিয়া ভজন করিতে বসেন। পরে ঠাকুর মন্দির পঞ্চবার পরিক্রিমা হয়। তাহার পরে ঠাকুরের ভোজন হয়। আরতির সময় তাঁহারা বুকে হাত দিয়া দর্শন করেন। এইরূপে পঞ্চ বার আরতি হয়। ঠাকুরের ভোজন হইলে তাঁহারা কৃষ্ণ-কথায় প্রসাদ গ্রহণ করেন। আহারান্তে ঠাকুর মহাশয় একখানি হরিতকি গ্রহণ করেন, রামচন্দ্র কবিরাজ কিন্তু যথেষ্ট তাম্বূল গ্রহণ করেন।

তাহার পরে দুই জনে বসিয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করেন, ও অবকাশ মত আবার নাম গ্রহণ করেন। এইরূপে লক্ষ নাম লওয়া প্রত্যাহিক নিয়ম। যখন আরত্রিক হয়, তখন কখন কখন দুই জনে করতাল

বাজাইয়া নৃত্য করেন। সন্ধ্যা হইলে আবার কীর্ত্তন করিতে থাকেন। সে কীর্ত্তনের সময় রসের তরঙ্গ উঠে,—কম্প, মূর্চ্ছা প্রভৃতি নানাবিধ ভাবের উদয় হয়। এইরূপে নিশা অধিক হইলে দুই জনে শয়ন করেন।

ঠাকুর মহাশয়, তাহার পরে, আর চারিটি ঠাকুর স্থাপন করেন, যথা শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, ও শ্রীরাধারমণ। ইহার পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ ও বল্লভীকান্ত স্থাপিত হইয়াছিলেন। এই ছয় ঠাকুর-সেবার এরূপ পরিপাটী ছিল যে বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণবগণ সেবা দেখিতে আসিতেন।

ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রয় লইবার নিমিত্ত তখন বহুতর লোক আসিতে লাগিলেন। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, তখন প্রায় ভদ্র লোক শাক্ত ছিলেন, আর সামান্য লোকের দশা অতি হীন ছিল। নবশাখেরা নিজ নিজ ব্রাহ্মণের কাছে ভূত প্রেতিনীর মন্ত্র লইতেন। তখন বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করা, আর এখনকার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করা সমান। বৈষ্ণব হইলে জাতি যাইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বলরাম মিশ্র, ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য হইলেন, কাজেই তিনি গুরুর অধরামৃত পান করিতেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে কায়স্থের অধরামৃত পানে, অর্থাৎ প্রসাদ গ্রহণে, তাহার জাতি কিরূপে থাকে? এখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করায় তত বিপদ নাই, কিন্তু তখন সমাজের শাসন অতি প্রবল ছিল। ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাবে তখন দেশময় তরঙ্গ উঠিয়াছিল, আর ভক্তি পথে প্রবেশ করিতে ইতর মধ্যম উত্তম নানাবিধ লোক আসিতে লাগিল। যেমন গোপীগণ কুলের ভয় করেন নাই, তেমনি, যাঁহারা ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছেন, তাঁহারা আর সমাজের শাসন মানিতেন না। কাহাকে ঠাকুর মহাশয় আপনি মন্ত্র দিতেন, কাহাকে রামচন্দ্র মন্ত্র দিতেন, আর কাহাকেও

বা তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণ মন্ত্র দিতেন। সে সমুদয় কাহিনী বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। তবে তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণের কাহিনী কিছু কিছু বলিতে হইবে।

বলরাম মিশ্রকে ঠাকুর মহাশয় মন্ত্র-দান করায় ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়কে নিন্দা করিয়া বলিলেন, "তুমি সাধু হইয়াছ ভাল, কিন্তু মন্ত্র দিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই। তুমি শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দাও কেন?" কিন্তু তবু ঠাকুর মহাশয়, উপযুক্ত পাত্র পাইলে, ব্রাহ্মণকেও মন্ত্র দিতে লাগিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ ক্রমেই ঠাকুর মহাশয়ের বিরোধী হইয়া উঠিলেন।

ঠাকুর মহাশয় যদিও নিরীহ ভাল মানুষ, পিপীলিকাকে পর্য্যন্ত আঘাত করেন না; যদি তিনি কখন কাহার সহিত কথা বলেন, তবে করযোড় করিয়া বলেন, কিন্তু তবু তাঁহার একদল প্রকাণ্ড শত্রু হইয়া উঠিল। গ্রামের মধ্যেও এরূপ শত্রু ছিল, যাহারা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে গোপনে অনুসন্ধান লইত। কেহ বা এরূপও রাষ্ট্র করিল যে, তাঁহার চরিত্র মন্দ। এ দিকে ভিন্ন গ্রামে কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পিশাচ বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় কুলোক জগতে জন্মে নাই। ইহা সত্ত্বেও ঠাকুর মহাশয়ের যশ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন তিনি রামকৃষ্ণ ও হরিরামকে মন্ত্র দিলেন, তখন দেশে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল।

ইহাদের দুই ভ্রাতার বাড়ী গয়েসপুরে, পিতা শিবানন্দ আচার্য্য, আচার্য্য,—ধনবান দেশ-বিখ্যাত লোক, ভগবতী-উপাসক। ইহারা দুই ভাই পরম পণ্ডিত। দুর্গোৎসবের নিমিত্ত পদ্মাপারে ছাগাদি ক্রয়

করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় খেতরির ঘাটে পঁহুছি-লেন। দুই ভাই স্নান করিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র হাত ধরাধরি করিয়া স্নান করিতে আসিলেন।

ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র কৃষ্ণ-কথা কহিতেছেন ও শাস্ত্রীয় বিচার করিতেছেন, আর ইঁহারা দুই ভাই মন দিয়া শুনিতেছেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া দুই ভাই বুঝিলেন যে, ইঁহারা ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র কবিরাজ, কারণ তখন ইঁহাদের কথা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। সুতরাং দুই ভ্রাতা কুতুহল হইয়া, কিছু না বলিয়া, চুপ করিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বিশ্বাসের বিপরীত দুই একটী কথা শুনিয়া, আর থাকিতে পারিলেন না, কথার উত্তর দিলেন। তখন উভয় দলে ক্ষুদ্র একটু বিচারও হইল,—এক পক্ষে দুই ভাই, অপর পক্ষে রামচন্দ্র। ঠাকুর মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। বিচারের পর ঠাকুর মহাশয় কবিরাজ গৃহে ফিরিলেন, হরিরাম ও রামকৃষ্ণ তাঁহাদের সঙ্গে আসিলেন। ঠাকুর মহাশয় তখন তাঁহাদিগকে আদর করিয়া বসাইলেন ও প্রসাদ ভুঞ্জাইলেন।

ব্রাহ্মণ-কুমারদ্বয় তাঁহাদের সমুদয় কার্য্য দেখিলেন, দেখিয়া একে-বারে বিগলিত হইলেন। তখন দুই ভ্রাতা এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, "ঠাকুর মহাশয় ও কবিরাজ, ইঁহারা দুই জন মহাপুরুষ। এত ভক্তি মনুষ্যের কি হইতে পারে? ভক্তিতে এত মাধুর্য্য? এ দুই জনের সমুদয়ই মধুর,—কথা, অঙ্গ-ভঙ্গি, হাস্য, ক্রন্দন, পদবিক্ষেপ সমু-দায়ই লাবণ্যময়। কি আশ্চর্য্য, এরূপ ত কখন দেখি নাই? ইঁহারা ভগবানের কৃপাপাত্র। শ্রীকৃষ্ণ জগতের মন আকর্ষণ করেন, আর সেই তাঁহার প্রকৃত ভক্ত যে জগতের মন আকর্ষণ করে। এ দুইজনকে দেখিলে ইঁহাদের চরণে সর্ব্বস্ব দিতে ইচ্ছা হয়। ইঁহারা ভগবানের

প্রেরিত পাত্র। ইঁহারাই ভবসাগরের কর্ণধার সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ করিয়া অভিমানে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ হইল। যে ভগবানের প্রিয়, সেই ব্রাহ্মণ। আর যে দাম্ভিক, সেই চণ্ডাল। আমরা যাগ করিয়া, মন্ত্র পড়িয়া, ভগবানকে বশ করি। ভগবান কি মন্ত্রে বশ হন? কি মোহ! প্রেম ও ভক্তিই সার বস্তু। ইঁহারা সেই বস্তু দ্বারা ভগবানকে বশ করিয়াছেন।"

প্রাতে দুই ভাই দুই ঠাকুরের চরণে পড়িলেন। "প্রভু, আমাদের ভবসাগর পার কর," ইহাই বলিয়া জ্যেষ্ঠ হরিরাম, রামচন্দ্রের, ও কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ, ঠাকুর মহাশয়ের চরণ ধরিয়া পড়িলেন। উভয়ে উভয়কে উঠাইলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "বাপু, তোমার পিতা বড় লোক। তিনি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন, সমাজ উৎপীড়ন করিবে, ইহার কি ভাবিয়াছ?" ইহাতে দুই ভাই বলিলেন, "প্রভু! শেষ ভালই ভাল। আগের ভাল শেষের মন্দ আমরা চাই না। যদি আমরা কৃপা পাই, তবে সমাজ ও পিতা আমাদের কি করিতে পারেন?" দুই ভাই মন্ত্র নিলেন, আর খেতরি থাকিয়া ভক্তি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, ছাগাদি লইয়া আর গৃহে গমন করিলেন না। ক্রমে এ সংবাদ দেশে প্রচার হইতে লাগিল। দেশে যদি একজন ভদ্র-সন্তান খ্রীশ্চিয়ান হয়েন, তবে সে কথা কি গোপন থাকে? দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। গয়েশপুরে কাজেই তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল। পিতা, পুত্রদিগকে ধরিতে লোক পাঠাইলেন। দুই ভাই অকুতোভয়ে পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চরণে প্রণাম করিলেন।

কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে যদি কেহ খ্রীশ্চিয়ান হয় তাহাতে সমাজের যেরূপ মনোকষ্ট হয়, শিবানন্দের পুত্রদ্বয় শূদ্রের নিকট মন্ত্র লওয়াতে গয়েশপুরে সেরূপ হইল। পুত্রদ্বয় প্রণাম করিলে, পিতা দূর

দুর্ল বলিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সন্তাপিত পিতা মনদুঃখে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "হরে হরে! তুই যদি মজিবি, তোর ছোট ভাই রামাটাকে মজাইলি কেন? হারে বেটারা, আমার পুত্র হয়ে একটা বৈষ্ণবের কাছে মন্ত্র নিলি? তা যদি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব হইত, তবু বুঝিতাম। তাহার মধ্যে একটা কায়েৎ, আর একটা বদ্দি। ওরে তোরা বামুনের ছেলে হয়ে একটা বদ্দির পা ধরিলি? তোদের একটু ঘৃণা করিল না? তাদের প্রসাদ খাবি আর ব্রাহ্মণে তোদের লইয়া পংক্তি করিবে কেন?"

তাঁহারা করযোড়ে বলিলেন, "পিতা, আমরা কিছু অন্যায় করি নাই। আপনি বিচার করুন, বিচার করিয়া আমাদিগকে নিরস্ত করুন, তবে আমরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার মন্ত্র লইব।" ইহাতে পিতা সন্তুষ্ট হইলেন, হইয়া তখনি তাহাই স্বীকার করিলেন; ভাবিলেন, এ মোটা কথা, ইহার আবার বিচার কি? শিবানন্দ ইহাই ভাবিয়া ভাল ভাল পণ্ডিতগণকে আনাইলেন।

বিচার হইল, ইহাতে শিবানন্দের পুত্রদ্বয়ের জয় হইল। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া মিথিলার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মুরারিকে আনিলেন। আবার বিচার হইল, দিগ্বিজয়ীও পরাভব হইলেন। যথা নরোত্তম বিলাসে:—

> পরাভব হয়ে দিগ্বিজয়ী সবে কয়।
> বৈষ্ণব মহিমা কহি মোর সাধ্য নাই॥
> এত কহি দ্রব্য সব কৈল বিতরণ।
> লজ্জা হেতু দেশে পুন না কৈল গমন॥
> ভিক্ষা ধর্ম্ম আশ্রয় করিল সেইক্ষণে।
> "মুরারি তৃতীয় পন্থা" কহে সর্ব্বজনে॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলে দেশে একটী তরঙ্গ উঠে। সেই তরঙ্গে আপামর সাধারণ সকলেই একটু উন্নতি লাভ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বে দুই একখানি বাঙ্গলা গ্রন্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের পরে সহস্র সহস্র বাঙ্গলা গ্রন্থ লিখিত হইল। পণ্ডিতদের মধ্যেও হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সংস্কৃতগ্রন্থ এত লেখা হইল যে, তাহার সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের দলবল নিজ ধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্ত নানা গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নানাবিধ পণ্ডিতের সহিত তর্ক করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের যেখানে যে দুর্ব্বলতা দেখিলেন, তাহা সংশোধন করিতে লাগিলেন। এরূপ বলীয়ান, নবজীবন-প্রাপ্ত দলের সহিত নির্জ্জীব প্রাচীন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ কেন পারিবেন? কাজেই শাস্ত্র-যুদ্ধে ও তর্ক-যুদ্ধে বৈষ্ণবগণ প্রায় সর্ব্বস্থানেই জয়লাভ করিতে লাগিলেন। হরিরাম ও রামকৃষ্ণ জয়লাভ করিয়া সমাজে আবার পদস্থ হইলেন।

ভক্তি-গ্রন্থের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই ভক্তি-গ্রন্থের প্রধান তাৎপর্য্য ভক্তি-ধর্ম্ম স্থাপন,—তর্কের দ্বারা নয়, শাস্ত্র দ্বারা। প্রভুর ভক্তগণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, তাঁহারা সমস্ত শাস্ত্র নিংড়াইয়া ভক্তি শাস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। সেই সমস্ত গ্রন্থ লইয়া উহা প্রচার করিতে ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি গৌড়দেশে আগমন করেন। যে সকল পণ্ডিত এ সমুদয় বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করেন নাই, তাঁহারা এই মহা তেজিয়ান বৈষ্ণবগণের সঙ্গে পারিবেন কেন?

বিষ্ণুপুর।

—:*:—

খেতরি হইতে বিদায় লইয়া আচার্য্য প্রভু বিষ্ণুপুরে গমন করিলেন। সেখানে খেতরির মহোৎসবের ন্যায় আর একটী মহোৎসব করিবার প্রস্তাব হইল। রাজা কৃষ্ণানন্দ যেরূপ মহোৎসব করিয়াছেন, রাজা হাম্বির সেইরূপ করিবেন সংকল্প করিলেন। কার্ত্তিক মাসে রাস-পূর্ণিমায় মহোৎসব হইবে স্থির হইল। সকল মহান্তগণের নিমন্ত্রণ হইল।

এখানেও প্রায় খেতরির ন্যায় বৃহৎ ব্যাপার হইল। মদনমোহন ঠাকুর ও আর ৩৮০ ঠাকুর লইয়া রাসমঞ্চ প্রস্তুত হইল। ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র গমন করিলেন। সেখানে ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তন হইল। তাঁহার কীর্ত্তনীয়াগণের নাম বোধ হয় সকলে জানেন না। ঠাকুর মহাশয় সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার সঙ্গীতের প্রণালী অর্থাৎ, গড়েরহাঁটের কীর্ত্তন, তিনিই সৃষ্টি করেন। রামচন্দ্রের কণ্ঠও অতি মধুর। তাহার পরে দেবী দাস, গৌরাঙ্গ দাস বল্লভ দাস, জয়নারায়ণ ঘোষ, ফাগু চৌধুরী, বিনোদ রায়, রূপনারায়ণ প্রভৃতি। রাজা বীর হাম্বিরের সহিত ঠাকুর মহাশয়ের মিলন হইল। ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রের সহিত সেখানে চারিমাস বাস করিলেন, আর ফাল্গুন মাস নিকটবর্ত্তী জানিয়া নিজ কার্য্যোপলক্ষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আচার্য্য প্রভু জাজি-গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীবিষ্ণুপুরের মহোৎসবের সময় তিন জনে—অর্থাৎ আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র,—শ্রীনবদ্বীপ পরিভ্রমণের পরামর্শ স্থির হইল। ঠাকুর মহাশয় আপনার ফাল্গুন-উৎসব সমাপ্ত করিয়া, রামচন্দ্রকে সঙ্গে

করিয়া, আচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় বাড়ী জাজিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য প্রভুর আর এক বাড়ী বিষ্ণুপুরে। সেখানে আচার্য্য প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া তিনজনে শ্রীনবদ্বীপ দর্শন ও পরিভ্রমণ করিতে চলিলেন। বরাবর প্রভুর বাড়ীতে গেলেন, যাইয়া দেখেন যে, সেখানে ঈশান ব্যতীত আর কেহ নাই, আর সকলে অদর্শন হইয়াছেন। রজনীতে প্রভুর বাড়ীতে বাস করিলেন, আর প্রভুর গুণ-কীর্ত্তনে সমস্ত নিশি জাগরণ করিলেন। পরে সমস্ত নবদ্বীপ দেখাইবার নিমিত্ত ঈশানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ঈশান যদিও অতি বৃদ্ধ, তবু তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলেন, এবং আর তিন জনকে সমস্ত শ্রীধাম দেখাইলেন। তাঁহারা ঈশানের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গের সমুদয় লীলা শুনিলেন। ঈশান প্রভুর বাড়ী চীরকাল বাস করিয়া প্রভুর নবদ্বীপের লীলা সমুদয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। কয়েক দিবস পরে সকলে জাজিগ্রামে আসিলেন, এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র কবিরাজ খেতরি আসিলেন।

এখন গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কথা বলিব। ইনি কুলীন ব্রাহ্মণ; গঙ্গাতীরে বালুচরের নিকটে গাম্ভিলা গ্রামে ইঁহার বাস। অতিশয় পণ্ডিত বলিয়া সকলে ইঁহাকে সম্মান করেন। হরিরাম ও রামকৃষ্ণের সহিত গাম্ভিলা গ্রামে তাঁহার দেখা হইল। গঙ্গানারায়ণ বলিলেন, "তোমরা এরূপ পণ্ডিত ও মহাবংশীয় হইয়া কিরূপে শূদ্রের কাছে মন্ত্র নিলে?" তাহাতে দুই ভাই বলিলেন, "শূদ্র ব্রাহ্মণ বিভেদ ভগবানের চক্ষে নাই। যে তাঁহার ভক্ত সেই ব্রাহ্মণ।"

একথা গঙ্গানারায়ণ কেন শুনিবেন? কিন্তু একটু আলাপ করিয়া তাঁহাদের কথায় তিনি মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা অতি নম্র হইয়াছেন; আর দেখিলেন যে,

তাঁহাদের মধুর চরিত্রে তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। কাজেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার একটু শ্রদ্ধা হইল। তিনি হরিরাম ও রামকৃষ্ণকে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। তিন জনে সমস্ত রাত্রি শাস্ত্র-বিচার ও কৃষ্ণকথা হইল। হরিরাম রামকৃষ্ণ যখন ভগবানের গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন, তখন আনন্দে তাঁহাদের অশ্রু, পুলক প্রভৃতি নানাবিধ ভাব হইতে লাগিল, আর সেই তরঙ্গের আঘাত গঙ্গানারায়ণের হৃদয়ে লাগিতে লাগিল।

গঙ্গানারায়ণ ভাবিতেছেন, এ আবার কি? ভগবানে এত গাঢ় অনুরাগ! ইহারা যে তাঁহার নাম করিতে আনন্দে গদ গদ হয়! আমার এক মাত্র কন্যা, আমার প্রাণ হইতে অধিক। তাহার নাম করিতে ত আমার ইহার সহস্রাংশের একাংশও আনন্দ হয় না? ভগবান কাজেই ইহাদের বাধ্য হইবেন। এত প্রীতিতে অসুর বাধ্য হয়, ভগবান দয়াময়, তিনি কেন বাধ্য না হইবেন? আর তিনি যদি কাহারও বাধ্য হয়েন, তবে এরূপ অনুগত ভক্ত ছাড়া আর কাহার হইবেন? আমি দেশ-মান্য পণ্ডিত, আমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, কৈ আমার চক্ষে ত এক বিন্দু জলও আইসে না? কৈ ভগবানের উপর আমার ত বিন্দুমাত্র প্রীতি কি ভক্তি আনিতে পারিতেছি না? ইঁহারা কি ভাগ্যবান! ইঁহাদের ভাগ্য কি আমার হইবে? যদি এরূপ ভাগ্য পাই, তবে মুচিরও চরণামৃত খাইতে পারি।

গঙ্গানারায়ণ ইহা ভাবিয়া মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন, "ইহাদের ভাগ্য আহরণ করিব, ইহাতে যাহা হয় তাহা হইবে। জাতি দিব, কুল দিব, সমাজের যে সম্মান তাহা ভস্মে দিব।" তখন গঙ্গানারায়ণ, গোপীগণ কিরূপে কুল শীল দিয়াছিলেন, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝিলেন। এক রাত্রে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইল, তিনি দুই ভাইয়ের পা ধরিয়া পড়িলেন। চরণে

পড়িতে পড়িতে বলিলেন, "তোমরা আমাকে ঠাকুর মহাশয়ের কৃপা অর্জ্জন করিয়া দাও।" দুই ভাই ইহাতে তটস্থ হইয়া তাঁহার হাত ধরিলেন, আর বলিলেন, "ঠাকুর মহাশয়ের কৃপার জন্য এত ব্যস্ত কেন? তুমি তাঁহাকে কৃপা করিলে তিনি কৃতার্থ হইবেন।" কথাই এই লোক বলে, শ্রীভগবান আমাকে কৃপা কর। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভগবান জীবের কৃপা পাইলে কৃতার্থ হয়েন।

সে রাত্রি আর কাহার নিদ্রা যাওয়া হইল না। প্রত্যূষে তিন জনে খেতরি চলিলেন। খেতরি আসিয়া, গঙ্গানারায়ণকে বাহিরে রাখিয়া, দুই ভাই ঠাকুর মহাশয়কে সংবাদ দিলেন, আর গঙ্গানারায়ণের অবস্থা বলিলেন। গঙ্গানারায়ণ বিখ্যাত লোক, ঠাকুর মহাশয় নাম শুনিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। গঙ্গানারায়ণ আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, বড় অভিমানী, সুতরাং আমার গতি তোমার চরণ ব্যতীত কোথাও নাই।" ঠাকুর মহাশয় গঙ্গানারায়ণকে উঠাইয়া হৃদয়ে ধরিলেন, আর বলিলেন, "বাপ! শ্রীগৌরাঙ্গ যখন স্বয়ং আসিয়াছেন, তখন আর ভয় কি? তোমাকে পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।"

শুভ দিনে গঙ্গানারায়ণ মন্ত্র-দীক্ষা লইলেন, ও অতি অল্প দিনের মধ্যে পরম অধিকারী হইলেন; এমন অধিকারী হইলেন যে, তাঁহার নামে ভুবন পবিত্র হয়। একে পণ্ডিত, তাহাতে ভক্তিগ্রন্থ সমুদয় পড়িয়া অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন। তখন শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। তিনিও খেতরি থাকিয়া গেলেন। এইরূপে জগন্নাথ আচার্য্য প্রভৃতি বহুতর প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য হইলেন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ক্রমেই কুপিত হইতে লাগিলেন। যদি শূদ্রে

ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দেয়, তবে তাঁহারা গুরু ও শিষ্যকে দণ্ড করেন, কিন্তু ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণকে দণ্ড দিতে পারিতেছেন না। প্রথমে যখন বলরাম মিশ্র, ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্র লইলেন, তখন তিনি "একঘরে" রহিলেন। কিন্তু এখন কে কাহাকে একঘরিয়া করে? যেহেতু ঠাকুর মহাশয়ের গণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এক বৃহৎ দল হইয়াছেন। তখন ব্রাহ্মণগণ নিরুপায় হইয়া রাজা নরসিংহের আশ্রয় লইলেন। সে দেশের অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণগণের জাতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আপনি রাজা, আমাদের জাতি-রক্ষক। আপনি আমাদের লইয়া চলুন, আমরা কৃষ্ণানন্দের বেটা নরোত্তম দাসকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিব।" রাজা নরসিংহ ভক্তিমান লোক, তাঁহার ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন করিবার ইচ্ছা ছিল। তিনি এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন, এবং তাঁহার ভাই রূপনারায়াণ ও অধ্যাপক সকলকে সঙ্গে লইয়া খেতরির নিকটে কুমারপুর গ্রামে শিবির স্থাপন করিলেন।

ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার গণ এই সংবাদ শুনিলেন। ঠাকুর মহাশয় শুনিয়া বড় ভীত হইলেন। অধ্যাপকগণের সহিত ঘট পট লইয়া মারামারি করার তাঁহার সময়ও নাই, সাধও নাই, সুতরাং তিনি কাতর হইয়া রামচন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণের পানে চাহিলেন, এবং বলিলেন, "এখন আমার উপায় তোমরা কর। এই সংবাদ শুনিয়া আমার প্রাণ একেবারে শুখাইয়া গিয়াছে" ইহাতে তাঁহারা দুইজনে বলিলেন, "তোমার কৃপাবলে তোমার কিছুই করিতে হইবে না। সব আপনি ভালই হইবে।"

তাঁহারা তখন পরামর্শ করিতে বসিলেন। পরামর্শে সাব্যস্ত হইল

যে, তাঁহারা ছদ্মবেশে রাজ-পণ্ডিতগণের সঙ্গে বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিবেন। উভয়ে ভক্তিরসে টলমল করিতেছেন, সুতরাং বালকের ন্যায় কৌতুকী। উভয়ে ছদ্মবেশ ধরিলেন। পরামর্শ করিয়া রামচন্দ্র হইলেন বারুই, আর গঙ্গানারায়ণ হইলেন কুমার। এইরূপে দুইজনে পান ও হাঁড়ি লইয়া কুমারপুরের বাজারে পান ও হাঁড়ি বিক্রয় করিতে বসিলেন। রাজার সঙ্গে পড়ুয়াগণ অবশ্য বাজার করিতে করিতে আসিবেন, আসিলে তাঁহাদের সহিত দ্বন্দ্ব করিবেন, এই তাঁহাদের চক্র। প্রকৃত তাহাই হইল, পড়ুয়াগণ বাজার করিতে আসিলেন। কেহ পান ক্রয় করিতে গেলেন, আর রামচন্দ্র সংস্কৃতে মূল্য বলিলেন! পড়ুয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি সংস্কৃত জান?" রামচন্দ্র সংস্কৃতে আবার বলিতেছেন, "আমার বাড়ী খেতরি," আর গঙ্গানারায়ণকে দেখাইয়া বলিললেন, "ইহার বাড়ীও খেতরি; জান না, সে ঠাকুর মহাশয়ের গ্রাম, সে খানে থাকিয়া আমরা শুনিয়া শুনিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছি। তোমরা কি পড়?" তাঁহারা গৌরব করিয়া খুব বড় বড় পুঁথির নাম করিলেন। রামচন্দ্র সেই পুঁথির কথা তুলিলেন। পড়ুয়াগণ প্রথমে বারুইর সঙ্গে এরূপ শাস্ত্র বিচারে অবশ্য ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। রামচন্দ্র পড়ুয়াগণের স্বভাব বেশ জানেন, তিনি অল্প অল্প টিটকারী দিতে লাগিলেন। পড়ুয়াগণের ইহা অসহ্য হইল। তাঁহারা একটী কথায় উত্তর দিলেন, তাহার উত্তর শুনিলেন। এইরূপে ঘোর দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেল। এক পড়ুয়া দুই পড়ুয়া, শেষে বাজারের যত পড়ুয়া ছিলেন, সমুদায় জুটিয়া গেলেন। একদিকে রামচন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণ, আর একদিকে পড়ুয়াগণ। পড়ুয়াগণ দেখিলেন বেগতিক, তখন কেহ দৌড়িয়া গিয়া এই কথা অধ্যাপক সভায় বলিলেন; বলিলেন, "ঠাকুর সর্ব্বনাশ উপস্থিত, হাটের এক কুমার ও এক বারুইর সঙ্গে পড়ুয়াগণের

শাস্ত্র-বিচার হইতেছে। তাহারা নাকি ঠাকুর মহাশয়ের কাছে থাকিয়া ও শুনিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। তাহারা মহাপণ্ডিত, অনর্গল সংস্কৃত বলে; আসুন, শীঘ্র আসুন, জাত গেল, মান গেল, সব গেল।"

অধ্যাপকগণ কিন্তু ঘৃণা করিয়া কেহ যাইতে চাহিলেন না। তখন আর এক ভগ্নদূত "বাপরে মারে" করিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিতেছেন, "আপনারা শীঘ্র আসুন, তাহাদের সঙ্গে কেহ পারিল না।" তখন অধ্যাপকগণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া একটী ছোটখাট বিদ্যাসাগরকে পাঠাইলেন। ক্রমে রহস্য দেখিতে দুই একজন করিয়া চলিলেন। অবশেষে অধ্যাপকের দল জুটিয়া গেলেন। শেষে রাজা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

রাজা মধ্যস্থ হইলেন, আর বিচার আরম্ভ হইল। অধ্যাপকগণের ইচ্ছা যে রাজা, কুমার ও বারুই দুই বেটাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেন। কেহ কেহ বা তর্ক করিতে করিতে সেইরূপ উদ্যোগও করিলেন, কারণ তাঁহারা অনেক, আর তাঁহারের প্রতিদ্বন্দী মোট দুইজন, বিশেষতঃ তাহারা বারুই ও কুমার। কিন্তু রাজা নরসিংহ তাহা করিতে দিলেন না। অধ্যাপক দেখিলেন যে, ভক্তি বলিয়া একটী শাস্ত্র আছে, আর সে ঘটপটের বাহির, এবং সে শাস্ত্রের তাঁহারা কিছুই জানেন না। ইহাতে অধ্যাপকগণ অপ্রতিভের একশেষ হইলেন। তখন রাজা বলিলেন, বিচার ত হইল। এতদূর আসিয়াছি, একবার খেতরি ও খেতরির ঠাকুর মহাশয়, ও তাঁহার ছয় বিগ্রহ দেখিয়া যাইব। অধ্যাপকগণ করেন কি, সকলেই যাইতে হইল। এদিকে, যথা নরোত্তম বিলাসেঃ—

রামচন্দ্র কাঙ্গালে ডাকিয়া দিল পান।
গঙ্গানারায়ণ হাড়ি করিল প্রদান॥

পরম কৌতুকে দোঁহে খেতরি আইল।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে সব নিবেদিল॥

রাজা নরসিংহ, তাঁহার ভ্রাতা রূপনারায়ণ ও অধ্যাপক সমুদায় সঙ্গে লইয়া, খেতরি আগমন করিলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।

এ কি স্থানের মাহাত্ম্য? না, ঠাকুর মহাশয়ের কৃপা? যাহাই হউক, ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী আসিবামাত্র দুই ভ্রাতার হৃদয় দ্রব হইল। তখন তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের দর্শন করিতে চাহিলেন। রামচন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণ, রাজা ও তাঁহার পার্ষদগণকে আহ্বান করিতে উপস্থিত হইবেন। তখন সকলে কুমার ও বারুইকে চিনিলেন। সে যাহা হউক, রাজা ঠাকুর মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে অতি ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "ঠাকুর! তোমাকে অপদস্থ করিতে আসিয়া, তোমার পদ পাইলাম। এখন আমাদিগকে আশ্রয় দাও।" ঠাকুর মহাশয় রাজার ভাব দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্র ও গঙ্গানারায়ণও রোদন করিতে লাগিলেন।

রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। অধ্যাপকগণ এই কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। দিবা নিশি কীর্ত্তন-বায়ু সকলের অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিল, তাঁহাদের মন নির্ম্মল হইল, আর তাঁহারাও একে একে ঠাকুর মহাশয়ের চরণ আশ্রয় করিলেন।

রাজা নরসিংহ আর বাড়ী গমন করিলেন না। খেতরিতে প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া রহিলেন। তাঁহার ঘরণী শ্রীমতী রূপমালা, স্বামীর অবস্থা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন, ও শিবিকা আরোহণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রূপমালা, স্বামীর ভাব দেখিয়া, কিরূপে

তাঁহার সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত হইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে কৃপা করিলেন? তাঁহার আকিঞ্চনে তিনি ঠাকুর মহাশয়ের বড়ই কৃপা পাইলেন। যথা নরোত্তম বিলাসে :—

জয় রূপমালা নরসিংহের ঘরণী।
যার ভক্তি রীতে ধন্য মানয়ে ধরণী॥

এইরূপে খেতরি গ্রামে দিবানিশি কীর্ত্তন, ভাগবত কথা, ভক্তিশাস্ত্র বিচার, শ্রীগঙ্গানারায়ণের ভাগবত পাঠ শ্রবণ, নামকীর্ত্তন পরিক্রমণ, বিগ্রহসেবা, প্রভৃতি যখন যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপ করিতে লাগিলেন। বাড়ী আর কেহ গেলেন না, সকলেই খেতরিতে রহিয়া গেলেন। প্রত্যহই মহোৎসব হইতে লাগিল।

রামচন্দ্র কবিরাজ, ঠাকুর মহাশয়কে ছাড়িয়া এক তিল থাকিতে পারেন না, কাজেই তাঁহার বাড়ী যাওয়া হয় না। কিন্তু তিনি সংসারী, তাহাতে স্ত্রী বর্ত্তমান, স্ত্রী পিত্রালয়ে থাকেন। তিনি স্বামী হারাইয়া বড় ব্যাকুল হইলেন। বিশেষতঃ তিনি অপুত্রক, কোন উপলক্ষ নাই যে, তাহা লইয়া থাকেন। কোন রূপে স্বামীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। স্বামীকে পত্র লিখেন, উত্তর পান না। ইহাতে উপায়ান্তর না পাইয়া একটী পরামর্শ স্থির করিলেন। ভাবিলেন যে, বরাবর একেবারে ঠাকুর মহাশয়কে ধরিবেন। কিন্তু কিরূপে? ভাবিলেন, পিতার দ্বারা এই কার্য্য করিবেন। তাই বৃদ্ধ পিতার নিকট লোক দ্বারা ঠাকুর মহাশয়ের কাছে পত্র লিখিতে বলিলেন। রামচন্দ্রের শ্বশুর, নিজ কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া ঠাকুর মহাশয়কে প্রকৃতই পত্র লিখিলেন যে, তিনি যেন একবার রামচন্দ্রকে পাঠাইয়া দেন। ঠাকুর মহাশয় পত্র পাইয়া জেদ্ করিয়া রামচন্দ্রকে পাঠাইয়া দিলেন। রামচন্দ্র শ্বশুরালয়ে গেলেন, শ্বশুর অত্যন্ত আদর

করিলেন, নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের সে সমুদায়ে রুচি হইল না। স্ত্রী আসিলেন, তাঁহার সহিত রুক্ষ কথা কহিতে লাগিলেন। স্ত্রী ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িলেন, আর প্রত্যুষে রামচন্দ্র পলায়ন করিলেন!

স্ত্রী নিরুপায় হইয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, তিনি স্বয়ং ঠাকুর মহাশয়কে পত্র লিখিবেন। ইহা সংকল্প করিয়া, পত্র লিখিয়া, ঠাকুর মহাশয়ের হস্তে দিতে বলিয়া, লোক পাঠাইলেন। পত্রে লিখিলেন, "আমি অতি দীনা, তাহে কুলবালা; যাইয়া তোমার চরণ দর্শন করি, সে অধিকার আমার নাই। আপনি যদি কৃপা করিয়া এই অধমার বাড়ীতে পদার্পণ করেন, তবে কৃতার্থ হই। আপনার কবিরাজকে সেখানেই রাখিবেন- কিন্তু শুনিতে পাই আপনাদের পরস্পরের বড় প্রীতি, তিলার্দ্ধ কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। এই নিমিত্ত তাঁহাকে ছাড়িয় যদি আসিতে না পারেন ভাবিয়া, সঙ্গে করিয়া আনেন, তবে আমি কিরূপে নিষেধ করিব?"

এই পত্র পড়িয়া ঠাকুর মহাশয় বড় দুঃখিত হইলেন, হইয়া রাম চন্দ্রকে বলিলেন, "তোমার স্ত্রী আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, তুমি একবার বাড়ী যাও।" ইহাতে রামচন্দ্র কোন উত্তর করিলেন না। তার পর দিন ঠাকুর মহাশয় আবার বলিতেছেন, "আমার সতীন আমার উপর রাগ করিয়াছেন, রাগ করিবার কথা বটে। পত্রখানা পড়িয়া দেখ, আমার দিব্য লাগে যদি তুমি না যাও।" কাজেই রামচন্দ্র বাধ্য হইয়া চলিলেন। রামচন্দ্র যখন যাইতে উদ্যত হইলেন তখন মহাগোল। রামচন্দ্রের শ্বশুরালয় খেতরি হইতে অতি নিকটে। রামচন্দ্র যাইবেন আবার আসিবেন, কিন্তু তবু যখন উভয়ে ছাড়াছাড়ি হন, তখন উভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। রামচন্দ্রকে পাঠাইয়া, ঠাকুর মহাশয়ের কিরূপ

অবস্থা হইল, তাহা প্রেম বিলাসে এইরূপ বর্ণিত আছে :—

পাঠাইবা মাত্রে তাঁহে ঠাকুর মহাশয়।
কারে কিছু না বোলয়ে, স্তব্ধ ভাবে রয়॥

আবার রামচন্দ্রের কি দশা হইল, তাহা ঐ গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা :—

কবিরাজের পথে যাইতে কত উঠে মনে।
কোথা বা যায়, তাহা কিছু নাহি জানে॥
ঘরে নাহি মন, চাহে খেতরির পানে।

প্রভাতে ঠাকুর মহাশয় উঠিয়া যখন ঠাকুর দর্শন করিতে আসিলেন, তখন দেখেন যে রামচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। আর কি করিতেছেন—না, ঠাকুর বাড়ী ঝাড়ু দিতেছেন! ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়া রামচন্দ্র অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আপনার পৃষ্ঠে সেই ঝাটা মারিতে লাগিলেন, আর আপনাকে বলিতে লাগিলেন, "ধিক! ধিক! তোমাকে। তুমি কোথা কি সুখ করিতে গিয়াছিলে?" ঠাকুর মহাশয় ব্যস্ত হইয়া রামচন্দ্রের হস্ত ধরিলেন, আর দুই জনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর মহাশয় উদাসীন, সংসারের সর্ব্ব সুখ বিবর্জ্জিত। ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র এক প্রাণ। ঠাকুর মহাশয়কে ফেলিয়া স্ত্রী লইয়া রাত্রি বাস করিতে রামচন্দ্রের কোন ক্রমে রুচি হয় না। "ঠাকুর মহাশয় মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া থাকিলেন। আমি কিরূপে উত্তম শয্যায় স্ত্রী লইয়া শয়ন করিব?" এই রামচন্দ্রের মনের ভাব। এই নিমিত্ত রামচন্দ্র স্ত্রীর নিকট যাইতে চাহেন না।

তাহার পরে তিনি ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গী। তিনি সংসারের অপবিত্রতা স্পর্শ করিয়া আবার ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গ কিরূপে করিবেন?

ঠাকুর বাড়ীর ঝাড়ু দেওয়া রামচন্দ্রের সেবা নয়। কিন্তু স্ত্রীর নিকট হইতে আসিয়া আপনাকে এরূপ হীন বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন যে, ইচ্ছা করিয়া হীন-সেবা করিতে লাগিলেন। আর ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়া অনুতাপানল প্রজ্জলিত হওয়াতে, দুঃখে আপনার পৃষ্ঠে আপনি ঝাড়ু মারিতে লাগিলেন। অবশ্য সমুদায় তাঁহারি দোষ। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বাহ্য অপবিত্রতা বড় একটা কিছু নয়। শিশু বেলা প্রভু ঝুটা হাড়ির উপরে বসিয়া জীবকে সে শিক্ষা দেন। তবে কি না, রামচন্দ্রের উদাসীনের সহিত বাস। সেই নিমিত্ত স্ত্রীর কাছে যাইতে বাধ বাধ করে। কিন্তু প্রধান কথা এই যে, ঠাকুর মহাশয় মৃত্তিকায় শয়ন করেন, তিনি কিরূপে উত্তম শয্যায় শয়ন করিয়া শান্তি পাইবেন। তাই ঝাড়ু দিতেছিলেন, তাই ঠাকুর মহাশয়ের দর্শনে অনুতাপানলে জলিয়া উঠিলেন।

তবে তাঁহার স্ত্রীর দুঃখ; কিন্তু সাধুগণ সে দুঃখ দেখিতে পান না। তাঁহারা বলেন, "তোমার বিরহ-জনিত দুঃখ বটে; কিন্তু আমারও ত সে দুঃখ আছে। আমি যে ভগবানের ভজন করিতেছি, ইহাতে কি তোমার মঙ্গল হইবে না?" বোধ হয়, রামচন্দ্র ইহাই বলিয়া তাঁহার অশেষ ভাগ্যবতী স্ত্রীকে বুঝাইতেন।

রাজা চাঁদ রায়।

—:*:—

এখন চাঁদ রায়ের কথা বলিব। রাঘবেন্দ্র রায়, ব্রাহ্মণ জমিদার, বাড়ী গৌড়ের নিকট। চৌরাশী হাজার টাকার জমিদারী রাখেন। তাঁহার দুই পুত্র, সন্তোষ রায় ও চাঁদ রায়। চাঁদ রায় বীরপুরুষ হইয়া উঠিলেন। শিবাজী যেরূপ ক্রমে বিজয়া নগর অধিকার করেন, তিনিও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে গৌড়রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী আর বহুতর পায়দল সৈন্য ছিল। তিনি শক্তি-মন্ত্র উপাসক, মদ্যপায়ী, সুতরাং যথেচ্ছাচারী। দিবানিশি যুদ্ধে বিব্রত হইয়া, মদ্যপান করিয়া, আর নানাবিধ নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া চাঁদ রায় পরিশেষে বায়ুগ্রস্ত বা ভূতগ্রস্ত হইলেন।

পিতা রাঘবেন্দ্র তখন নানা ঔষধ প্রয়োগ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করিলেন! কিন্তু পুত্রের বায়ুরোগ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। কোন একজন ভাল লোক পরামর্শ দিলেন যে, ঠাকুর মহাশয়কে আনিলে রোগ ভাল হইবে। রাঘবেন্দ্রের অবশ্য ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি ভক্তিমাত্র নাই। তবে পুত্রের রোগ, কাজেই ভাবিলেন যে, যদি ঠাকুর মহাশয়ের কোন দৈবশক্তি থাকে, তবে ভাল হইতেও পারে। ইহাই ভাবিয়া, রাঘবেন্দ্র, একখানি পত্র লিখিয়া, রাজা কৃষ্ণানন্দের নিকট এই অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার পুত্র নরোত্তমকে পাঠাইয়া দেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ পত্র পাইয়া নরোত্তমের হাতে দিলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "এ সব পত্র আমাকে শুনাইয়া কেন দুঃখ দেন? আমার রোগ ভাল করিবার ক্ষমতা নাই।"

কৃষ্ণানন্দ উত্তর লিখিয়া দিলেন যে, তাঁহার পুত্রের যাওয়া হইবে না। তখন রাঘবেন্দ্র স্বপ্নে দেখিলেন যে, শ্রীদুর্গা আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "রাঘবেন্দ্র, তোমার পুত্রকে ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রয় লইতে বল, তবে সে আরোগ্য হইবে ; আর তোমারা গোষ্ঠীবর্গে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমরা সন্তোষ হইব।"

রাঘবেন্দ্র এই আদেশ পাইয়া দুইটী ব্রাহ্মণের দ্বারা, খেতরিতে রাজা কৃষ্ণানন্দের নিকট, সকল কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে ভগবতী যাহা স্বপ্নে বলিয়াছেন, তাহাও লেখা হইল। রাঘবেন্দ্র আরও লিখিলেন যে, তাঁহার পুত্রকে স্থানান্তরিত করিবার অবস্থা নাই, থাকিলে তাহাকে লইয়া ঠাকুর মহাশয়ের চরণে উপস্থিত হইতেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ এই পত্র লইয়া, ভয়ে ভয়ে আবার পুত্রের নিকট দুই ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "আপনারা অদ্য আমাকে ক্ষমা করুন, কল্য যাহা হয় বলিব।"

তৎপরে ঠাকুর মহাশয় নির্জ্জন পাইয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, তুমি কি বল? আমি নিতান্ত চিন্তিত হইয়াছি, কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না।" রামচন্দ্র বলিলেন, "শুভস্য শীঘ্রং, চল যাই আর কি।" তাহাতে ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমতি ব্যতীত যাওয়া উচিত নয়। দেখা যাউক, তিনি কি বলেন।" ইহাই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরে কপাটের দিকে মস্তক দিয়া নিশিতে শয়ন করিয়া থাকিলেন। যাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস, শ্রীভগবান অবশ্য তাঁহাদের সহিত কথা কহিয়া থাকেন। আর যদি এরূপ ভক্তের সহিত তিনি কথাবার্ত্তা না বলেন, তবে তাঁহাকে লোকে ভজনা করিবে কেন, ভক্তি করিবে কেন, আর স্নেহ করিবে কেন? ঠাকুর মহাশয়ের একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, আর

তিনি স্বপ্নে দেখিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "নরোত্তম! জীবে উপকার পরম ধর্ম্ম। তাহার নিমিত্ত ইতস্ততঃ করিতেছ কেন? প্রত্যুষে তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর।"

তখন ঠাকুর মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া, রামচন্দ্রকে গৌরাঙ্গের আদেশের কথা শুনাইলেন। উভয়ে আনন্দে পুলকিত হইয়া তখনি যাইবার উদ্যোগ করিলেন। পদব্রজে যাইবেন ইহাই সাব্যস্ত করিলেন। সকলেই সঙ্গে যাইবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রামচন্দ্র, গঙ্গানারায়ণ, হরিরাম ও রামকৃষ্ণ প্রভৃতি এবং অন্যান্য বহুতর লোক চলিলেন। সকলে শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিয়া খেতরি আঁধার করিয়া বাহির হইলেন। পথে এক স্থানে সকলে রহিলেন; আর এক জন ব্রাহ্মণ, ঠাকুর মহাশয় আসিতেছেন, এই সংবাদ দিবার নিমিত্ত অগ্রে রাঘবেন্দ্রের নিকট চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর মহাশয় স্বগণ আসিতেছেন শুনিয়া, নগরের লোক সকল অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে আনিতে চলিল। কথা, তখন ঠাকুর মহাশয়ের নাম সকলে শুনিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয় আসিতেছেন ইহা বড় কথা; ইহাতে নগরের লোকে উন্মত্ত হইল, রাঘবেন্দ্রও বটে। ব্যস্ত হইয়া নগর সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। স্থানে স্থানে নহবৎ বসিল। নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল।

যথা প্রেমবিলাসে :—

ব্রাহ্মণ সজ্জন আদি লোক বহুতর
অনুব্রজি যায় পথে আনন্দ অন্তর॥
কত বাদ্য বাজে তাহা কে করে গণন।
কত দূর যাই সবে পাইল দর্শন॥

রূপ দেখি ঝুরে আঁখি পড়িল চরণে।
হাসিয়া সকল প্রতি কৈল সম্ভাষণে॥
যখন গ্রামেতে যাই হইল প্রবেশ।
দর্শন করয়ে লোকে আনন্দ আবেশ॥
পূর্ণ কুম্ভ পাতিয়াছে পথে স্থানে স্থানে।
কত শত কদলী বৃক্ষ করিয়া রোপণে॥
পুষ্প মালা গৃহে গৃহে রাজ পথে পথে।
কত সহস্র লোক চলেছে সঙ্গেতে॥
মঙ্গল হুলা-হুলি দেন যত নারীগণ।
আপনাকে ধন্য মানে সকল জীবন॥

এ সমুদায়ে ঠাকুর মহাশয়ের যে কিছু প্রীতি ছিল, তাহা নহে, তবে আমাদের শুনিতে আনন্দ হয় বলিয়া, উপরের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল।

ঠাকুর মহাশয় পদদ্বয় ধৌত করিয়াই বলিলেন, "চল, তোমার পুত্র কোথায়, সেখানে লইয়া চল।" রাঘবেন্দ্র লইয়া চলিলেন, আর ঠাকুর মহাশয়, গণ সহ, তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই ঘর পূর্ব্বদ্বারী। ঠাকুর মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিলে, রাঘবেন্দ্র শায়িত পুত্র চাঁদরায়কে কোলে উঠাইয়া বলিলেন, "বৎস! ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম কর।" কিন্তু পুত্র সে কথায় উত্তর করিল না, সেই দেহস্থিত ব্রহ্মদৈত্য উত্তর করিতে লাগিল। যথা "আমি ব্রাহ্মণ, চিরকাল কুকর্ম্ম করিয়াছি। আমি যেমন, চাঁদ রায় সেই রূপ, সুতরাং ইহার দেহ আশ্রয় করিয়া আছি। তোমার শুভ আগমনে, আমার উদ্ধার হইল। আমি এখন উন্নতি পথে চলিলাম। ঠাকুর মহাশয়, তোমার চরণে কোটি প্রণাম।" ইহাই বলিয়া চাঁদ রায়ের দেহ চীৎকার করিয়া শয্যায় অচেতন হইয়া পড়িল।

তখন মুখে জলের ছাটি, বায়ু ব্যজন প্রভৃতি সন্তর্পণে চাঁদ রায়ের চেতনা হইল। চাঁদ রায় মধ্যে মধ্যে যখন অল্প চেতন পাইতেন, তখন শুনিতেন যে, তাঁহার নিমিত্ত ঠাকুর মহাশয়কে আনিতে খেতরিতে লোক গিয়াছে। এখন চাঁদ রায় নিদ্রোত্থিতের ন্যায় এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ভ্রাতা সন্তোষ, রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "ভাই, ঐ দেখ ঠাকুর মহাশয়। তোমার পীড়া-দায়ক ব্রহ্মদৈত্য উঁহার প্রভাবে তোমাকে ত্যাগ করিয়াছে। এখন ঠাকুর মহাশয়ের চরণে প্রণাম কর।"

তখন দুই ভাই একত্র হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। চাঁদ রায় বলিতেছেন, "বিষয় মদে মত্ত হইয়া কি কুকর্ম্ম না করিয়াছি! ঠাকুর মহাশয় কি আমাকে কৃপা করিবেন?"

তখন চাঁদ রায় ভয়ে ভয়ে ঠাকুর মহাশয়ের চরণে পড়িলেন, সন্তোষ রায়ও পায়ে ধরিয়া পড়িলেন। রাঘবেন্দ্র ও তাঁহার ঘরণীও তখন ঠাকুর মহাশয়ের চরণে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেখানে ঠাকুর মহাশয়ের প্রধান পার্ষদগণ সকলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও আনন্দে বিহ্বল হইলেন। কাণ্ডটী কত বড় অদ্ভুত বিবেচনা করুন। এই ব্রাহ্মণকুমার, চাঁদ রায়, গৌড়ীয় পাতসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী, লক্ষ পদাতিক ও পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের প্রভু, পৃথিবীকে তৃণ জ্ঞান করেন, মদ্যপানে উন্মত্ত। অদ্য তিনি তাঁহার বাটীর নিকটস্থ একজন ক্ষুদ্র কায়স্থ-জমিদার পুত্রের চরণে লুণ্ঠিত হইতেছেন। যাঁহার নামে সপ্তদিবস-দূরস্থ ব্যক্তিগণ ভয়ে কম্পিত কলেবর, আজি তিনি এই উদাসীনের কৃপা পান কি না, তাহাই ভাবিয়া কাঁপিতেছেন! ভক্তির উদয় হইলে বড় ছোট, ও ছোট বড় হইয়া যায়। ঠাকুর মহাশয় দুই ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন।

তখন নগরে প্রাত্যাহিক মহোৎসব আরম্ভ হইল। রাঘবেন্দ্র পূর্ব্বের স্বপ্নাদেশে, ঠাকুর মহাশয়ের চরণে শরণ লইলেন। চাঁদ রায় ও সন্তোষ রায় দীক্ষা লইলেন। দুই ভাই আপনাদিগকে জগাই মাধাই ভাবিতে লাগিলেন। জগাই মাধাই দুই ভাই বহুতর লোকের উৎপীড়ন করিয়া নদীয়ার ঠাকুরালি পাইয়া প্রভুর কৃপালাভ করিয়াছেন। চাঁদ ও সন্তোষ ঐরূপ নানাবিধ কুকর্ম্ম করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় ভক্ত হইলেন।

প্রকৃত কথা, ভগবানের কৃপা কাহার উপরে কিরূপে পতিত হয়, তাহা মনুষ্য বুঝিতে পারে না। তবে চাঁদ রায় মহাশয়-লোক। তাঁহার আরও কাহিনী ক্রমে বলিব। ঠাকুর মহাশয় খেতরি প্রত্যাগমন করিতে চাহিলেন। তখন রাঘবেন্দ্র স্বগোষ্ঠী তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। সকলেই নৌকাপথে চলিলেন। এক নৌকায় ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার নিজ জন; এক খানিতে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ; অপর এক নৌকায়, রাঘবেন্দ্র ও তাহার পরিবারগণ; আর কয়েকখান নৌকা, খেতরির ছয় ঠাকুরকে অর্পণ করিবার জন্য, নানাবিধ উপহার দ্রব্যে বোঝাই। এই নৌকাগুলি নানাবিধ ধাতুপাত্র, বস্ত্র, তণ্ডুল, ঘৃত, শর্করা মুদ্গ প্রভৃতি দ্রব্যে পরিপূরিত।

সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত পথ চলিলেন। সমুদায় নৌকায় নিশান উড়িতেছে, আর বাদ্য বাজিতেছে। সেই যে নিশান উড়িতেছে, উহা যে চাঁদ রায় বা রাঘবেন্দ্র রায়ের গৌরব প্রচার করিতেছে, তাহা নয়। ঠাকুর মহাশয়ের গৌরব প্রচার করিতেছে?—তাহাও নয়। তবে কাহার?—না গৌরাঙ্গ প্রভুর। যাঁহার জয়ে ভুবনের জয়! এইরূপে সকলে খেতরির ঘাট উত্তীর্ণ হইলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ অগ্রবর্ত্তী হইয়া সকলকে আনিলেন। যে চাঁদ রায় সহস্র সহস্র বিপক্ষ প্রজা কি

বিরোধি শত্রুগণকে কারাগারে বন্ধন দশায় রাখিয়াছিলেন, অন্ত ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে ও তাঁহার সমুদায় গোষ্ঠীকে, আর একরূপ বন্ধনে বন্ধন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখে আনিলেন!

আবার খেতরিতে প্রত্যহ উৎসব হইতে লাগিল। দিবানিশি কীর্ত্তন, দিবানিশি ভজন, দিবানিশি পূজা ও দিবানিশি আনন্দ। তৎ-পরে চাঁদ রায়কে ঠাকুর মহাশয় বিদায় দিলেন এবং তিনি গৃহে প্রত্যা-গমন করিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চাঁদ রায় মহাশয়-লোক। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বিষয় কার্য্য অন্ত হস্তে ন্যস্ত করিলেন। ইহাতে অল্পকাল মধ্যে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। বাদসা তাঁহাকে কারা-গারে পুরিলেন, আর তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ ছিল বলিয়া, প্রাণে বধ না করিয়া, যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। চাঁদ রায়ের কতটুকু ভক্তি হইয়াছে, তাহার পরীক্ষার সময় আসিল। ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইয়া যখন একটী বৃক্ষ হয়, তখন বিপদরূপ ঝটিকায় হয় উহাকে, উৎপাটন করে, না হয় বদ্ধমূল করে। চাঁদ রায় এই বিপদে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। তখন মুসলমান ধর্ম্মবেত্তাগণ পরামর্শ দিলেন যে, চাঁদ রায়কে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হউক, আর তাহাতে তিনি স্বীকৃত না হইলে, হস্তীর পদ-তলে ফেলিয়া প্রাণে বধ করা হউক।

বলা বাহুল্য যে, চাঁদ রায় মুসলমান হইতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন চাঁদ রায়ের মৃত্যু দর্শন নিমিত্ত সভা হইল, ও মদ্যপানে মত্ত হস্তীও আনীত হইল। অতি দুর্ব্বল চাঁদ রায় মলিনবেশ পরিধান করিয়া সভায় দাঁড়াইয়া আছেন। দুর্ব্বল কেন,—না, অনাহারে ও যন্ত্রণায়। তখন বাদসাহ আবার বলিলেন, "দেখ, ঐ হস্তী প্রস্তুত। এখনও মুসলমান হও, নতুবা উহার পদতলে নিক্ষিপ্ত হইবে।" চাঁদ রায় বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা আমার ভাগ্য আর কি হইতে পারে? শ্রীভগবানের নিমিত্ত

তুমি আমাকে দণ্ড করিবে, এ আমার বড় ভাগ্যের কথা। আমাকে হস্তীর পদতলে লইয়া চল।" ইহাই বলিয়া "হরে কৃষ্ণ" নাম জপিতে জপিতে চাঁদ রায় স্বচ্ছন্দচিত্তে হস্তীর অগ্রে চলিলেন!

চাঁদ রায় যে, সাহসের উপর নির্ভর করিয়া চলিলেন তাহা নহে; কিম্বা নত হইবেন না এই অহঙ্কারে মত্ত হইয়াই যে তিনি চলিলেন, তাহাও নহে। তিনি ভাবিলেন, যিনি প্রাণ দিয়াছেন, তিনিই লইতেছেন, তাহাতে আর কথা কি? যখন চাঁদ রায় শ্রীভগবানের উপর এইরূপ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া চলিলেন, তখন স্বর্গে দেবগণের মধ্যে হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল; মর্ত্তেও বটে, যেহেতু মুসলমানগণ ভয় পাইলেন। চাঁদ রায়কে মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহাদিগের জ্ঞান হইল। তাঁহার তখনকার বদনের শোভা দেখিয়া মুসলমানগণের নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল। ভক্তির নিমিত্ত যিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাঁহার শ্রীমুখদর্শন কি কখন বিফল হয়? তবে কোন কোন স্থলে ইহার অন্যথা দেখা গিয়াছে বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদৃশ ব্যক্তি বিশুদ্ধ ভক্ত নহে। সে ব্যক্তি ভক্তির দ্বারা চালিত না হইয়া অহঙ্কারের কি দম্ভের দ্বারা চালিত হইয়া প্রাণ দিতে উদ্যোগী হইয়াছে। এখন যদি কাহাকে বল যে, তোমার ধর্ম্ম ত্যাগ কর, সে তখনি বলিবে যে, "উহা আমি কখনও করিব না।" পীড়াপীড়ি করিলে অনেকে স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু কোন কোন লোকে ইহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিলেন। এই সমুদায় লোকের মধ্যে কেহ নিজের অভিমানের নিমিত্ত, কেহ বা ভগবানের নিমিত্ত প্রাণপণ করে।

"আমি আমার ভগবানকে ছাড়িতে পারিব না," ইহা ভাবিয়া যে ব্যক্তি মৃত্যুর মুখে স্বচ্ছন্দে যায়, তাহার কি মৃত্যু আছে? আমরা জীব আমাদের নিমিত্ত যদি কেহ এরূপ প্রাণপণ করে, তবে তাহার জন্য

আমরা প্রাণ দেই। আর সেই দয়ার সাগর, সেই প্রেমের সাগর, শ্রীশ্রীভগবান, তিনি দেখিতেছেন যে, তাঁহার নিজ জন তাঁহার নিমিত্ত মরিতেছে, আর তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন! ইহা কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে? ইহা যদি হয়, তবে ভগবান নাই। যে রমণী স্বামীর সহিত চিতারোহণে যাইতে প্রস্তুত, তাঁহার বদনের শোভা তখন এরূপ হয় যে, তিনি ভুবনমোহিনী রূপ ধারণ করেন। তাঁহার প্রফুল্ল বদনে অমানুষিক তেজ বাহির হইতে থাকে। সে বদন দেখিলে আনন্দে হৃদয় দ্রব হয়, জগত সুখময় হয়, আর সেই রমণীর পদতলে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া, লুন্ঠিত হইতে ইচ্ছা হয়। চাঁদ রায়ের বদন দেখিয়া বাদসাহের হৃদয় দ্রব হইল।

বাদসাহ উঠিয়া চাঁদ রায়কে ধরিলেন, ধরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও তাঁহার সহিত মিত্রতা করিলেন। পরিশেষে কয়েক দিবস যত্নে রাখিয়া, পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতে হইল বটে, কিন্তু চাঁদ রায় স্বাধীন রাজা হইলেন। চাঁদ রায় বাড়ী গেলেন না, একেবারে খেতরি মুখে চলিলেন। অশ্বারোহিগণকে এপারে রাখিয়া একক খেতরি উপস্থিত হইলেন।

চাঁদ রায়কে মুসলমানগণ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, ইহাতে রাঘবেন্দ্র শোকাকুল হইয়া, সপরিবারে খেতরি গমন করিয়া, সেখানে কেবল কীর্ত্তানন্দে মগ্ন আছেন। শোক ও তাপ ভুলিবার একমাত্র মহৌষধ ভাবিয়া আর গৃহে গমন করেন নাই।

এমন সময় চাঁদ রায় একক গমন করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের চরণে পড়িলেন। বলিলেন, "ঠাকুর! তোমার দাসের কি বিপদ্ আছে?"

সকলে অবাক্! বিপক্ষগণ যেরূপ নির্দ্দয়, তাহা সকলে জানেন।

তাহাতে চাঁদ রায় তাঁহাদিগকে মর্ম্মে পীড়া দিয়াছেন। তখনকার যুদ্ধে বিচার আচার ছিল না। সেই চাঁদ রায় যে আবার রাজবেশে মুসলমানগণের হাত ছাড়াইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা হঠাৎ কে বিশ্বাস করিতে পারেন? এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, মুসলমান বাদসা রাজা চাঁদ রায়কে যোগ্য বসন ভূষণ দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন।

খেতরিতে ক্রমে উৎসব বাড়িতেছে, খেতরির ঐশ্বর্য্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। শিবসিংহের ন্যায় আরও দুই তিন জন রাজা পূর্ব্বে ঠাকুর মহাশয়ের শরণ লইয়াছিলেন। খেতরি যখন এরূপ ঐশ্বর্য্যশালী হইল, তখন ঠাকুর মহাশয়ের ভজনের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। যাঁহারা বিশুদ্ধ অনুরাগে ভজন করেন তাঁহারা গণ্ডগোল ভাল বাসেন না। ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া নির্জ্জনে থাকিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহারা নির্জ্জনে বাস করিলে, ছয় বিগ্রহের সেবার ব্যাঘাত হইবে, সেবার উত্তম বন্দোবস্ত না করিয়া তাঁহারা যাইতে পারেন না।

রামচন্দ্র বলিলেন যে, ছয় বিগ্রহ ছয় জনের হস্তে দেওয়া হউক, তাহা হইলে সেবার ত্রুটী হইবে না। সকলে আপন আপন ঠাকুর পাইলে আরও যত্নের সহিত সেবা করিবেন। তখন প্রধান শিষ্যগণকে ডাকিয়া এই প্রস্তাব করা হইল। সকলে আপন আপন ঠাকুর বাছিয়া লইলেন। ঠাকুর মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য বলরাম মিশ্র বরাবর শ্রীগৌরাঙ্গ যুগল পূজা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি সেই বিগ্রহ লইলেন। গঙ্গানারায়ণ রাধারমণ বিগ্রহ লইলেন ও তাঁহার পদতলে নিজ নাম লিখিলেন। অদ্যাবধি তাঁহার নাম সেই ঠাকুরের পদতলে লিখিত আছে। এইরূপে জয়নারায়ণ রায় এক বিগ্রহ পাইলেন, রবিরায় আর

এক ঠাকুর পাইলেন, এবং আর দুই ঠাকুর কে কে পাইলেন, তাহা জানা যায় না।

ঠাকুর মহাশয় যখন শ্রীখণ্ডে গমন করেন, তখন ঠাকুর নরহরির ভজন স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানের নাম বটডাঙ্গা। সে অপূর্ব্ব স্থানটী অদ্যাবধি আছে। সেইরূপ ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্ব হইতে একটী ভজন স্থান প্রস্তুত করাইতেছিলেন। বৃন্দাবনের অনুকরণ করিয়া সেই স্থানটী প্রস্তুত করান হইল। সে স্থানটী দেখিলে হঠাৎ বৃন্দাবন বলিয়া বোধ হইত। স্থানটী বাটীর এক ক্রোশ দূরে। ঠাকুর মহাশয় আর রামচন্দ্র সেইখানে গিয়া বাস করিলেন। সে স্থানটির নাম রাখা হইল "ভজনস্থলী।" অদ্যাপি সে স্থান বর্ত্তমান আছে।

ভূগর্ভ ও লোকনাথের যখন ২২।২৩ বৎসর বয়ঃক্রম, তখনি সংসার ত্যাগ করিয়া, গৌরাঙ্গের আজ্ঞাক্রমে, দুই জনে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া চির-জীবন চিরঘাটে বাস করিলেন। দুই জনের কুঞ্জ পাশাপাশি। ঠাকুর মহাশয় ও রামচন্দ্র সেইরূপই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও ঠাকুর মহাশয় সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই; কারণ, তাঁহার মাতা পিতা বর্ত্তমান। তাঁহাদিগকে প্রত্যহ দর্শন করিতে যাইতে হয়। উভয়ে নিতান্ত বৃদ্ধ ও রুগ্ন। ঠাকুর মহাশয় পিতা মাতার নিকট প্রত্যহ গমন করিয়া প্রণাম করেন, ও দুই দণ্ড বসিয়া কৃষ্ণ-কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করেন।

ক্রমে ক্রমে উভয়ে সঙ্গোপন হইলেন। ঠাকুর মহাশয় সাংসারীর নিয়ম অনুসারে তাঁহাদের নিমিত্ত যথাবিধি কার্য্যাদি করিলেন। পুত্রের শেষ কার্য্য করিয়া ঠাকুর মহাশয় নিশ্চিন্ত হইলেন। পূর্ব্বে ভূগর্ভ ও লোকনাথ অন্তর্ধান করিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয়ের বৃন্দাবনে যাইতে লোকনাথের আজ্ঞা ছিল না, কিন্তু তবু যত দিবস গুরু বর্ত্তমান, ততদিন

আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন না। কিন্তু এখন একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া ভজন স্থানে অতি নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি আর রামচন্দ্র। কেবল এই রামচন্দ্রই তাঁহার বন্ধন, আর কোন বন্ধন রহিল না।

তপস্যা, যোগ-সিদ্ধি, ধ্যান, ইত্যাদি একাকী করিতে হয়। কিন্তু প্রীতির ভজনা একাকী না করিয়া সঙ্গীর সহিত মিলিয়া করিলে রসের পুষ্টি হয়। সঙ্গী মনোমত হওয়া চাই, আর দুই একটীর বেশী না হয়। পরস্পরের দর্শনে, স্পর্শনে, কথায়, ভাবে, প্রেমের বর্দ্ধন হইতে থাকে। এইরূপে দর্শন, স্পর্শ ইত্যাদি প্রক্রিয়া দ্বারা গুরু শিষ্যকে শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন। আবার যখন দুই একটী মর্ম্মী সঙ্গী লইয়া কৃষ্ণকথা কি কীর্ত্তন হয়, তখনও ঐরূপ। একজন প্রেমে গদগদ হইয়া সঙ্গীর পানে চাহিলেন। সঙ্গী নীরব ছিলেন, কিন্তু সেই নয়নবাণে তিনিও প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। একজন ভগবানের গুণ বলিতেছেন, আর একজন শুনিতেছেন। যিনি বলিতেছেন, তিনি বলিয়া ও শুনাইয়া সুখ পাইতেছেন। আর যিনি শুনিতেছেন, তিনি শুনিয়া ও বলাইয়া সুখ পাইতেছেন। একজনের আনন্দ আর একজনকে দিতেছেন, দিয়া আপনার আনন্দ বাড়াইতেছেন। ইহাকেই বলে কৃষ্ণকথা।

এইরূপে দুই জনে কাল কাটাইতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের নামে বহু গ্রন্থ প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার সকল গুলি তাঁহার রচিত নহে। অনেকে, আপনাপন মত চালাইবার নিমিত্ত, ঠাকুর মহাশয়ের নামে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যদিও ঠাকুর মহাশয় সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত; কিন্তু সাধারণের উপকার হইবে বলিয়া, ঠাকুর নরহরির অনুকরণ করিয়া, তিনি বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখেন। যথা, স্মরণ মঙ্গল, উপাসনা পটল, প্রার্থনা, সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ইত্যাদি।

রামচন্দ্র কবিরাজ "অকিঞ্চন সর্ব্বস্ব" নামক গ্রন্থ লিখেন। ভজনস্থলীতে ঠাকুর মহাশয়ের অনেক গ্রন্থ লেখা হয়, তাহার সন্দেহ নাই। তবে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কখন লেখা হয়, তাহার কিছু আভাস ঐ গ্রন্থে আছে।

কখন বা উভয়ে আসিয়া ঠাকুর দর্শন করিতেন। কখন আরতির সময় করতাল হস্তে করিয়া আরতির গীত গাইতেন ও নৃত্য করিতেন। কখন বা সমস্ত নিশি ঠাকুরের আঙ্গিনায় ভক্তগণ লইয়া কীর্ত্তন করিতেন সে দিন ভক্তগণের আর আনন্দের সীমা থাকিত না। কোন কোন দিন বা ভজনস্থলীতে ভক্তগণকে ডাকাইয়া লইয়া যাইতেন, আর তাহারা শত শত লোকে খোল করতাল লইয়া সেই ক্ষুদ্র বৃন্দাবনে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন ও পরে বন-ভোজন করিতেন।

ভক্তগণ সকলে প্রত্যহ একবার ভজনস্থলীতে ঠাকুর মহাশয় ও কবিরাজ মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিতেন, ও দূর হইতে দর্শন করিয়া প্রণাম করিয়া আবার খেতরি যাইতেন। গঙ্গানারায়ণ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ঐ রূপে আসিতেন, নিকটে বসিতেন ও অল্পক্ষণ থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। ঠাকুর মহাশয় নির্জ্জনে আছেন, সুতরাং কেহ তাহার সমাধি ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করিতেন না।

যদিও রামচন্দ্রের ও ঠাকুর মহাশয়ের ভিন্ন ভিন্ন কুটীর ছিল বটে, কিন্তু তবু তাঁহারা দিবানিশি এক কুটিরেই থাকিতেন। যাঁহারা বিগ্রহ সেবা করিতেন, তাঁহারা এক এক দিন এক একজন প্রসাদ আনিয়া দিতেন। এক সন্ধ্যা আহার করা দেহ ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজন, তাহা এইরূপে হইত; আর তাঁহাদের প্রয়োজন কি? মৃত্তিকায় শয়ন, পরিধান জীর্ণ বস্ত্রের এক খণ্ড। শীতকালে গাত্রাবরণ একখানি ছেড়া কাঁথা। তৈজসের মধ্যে একটী করোয়া।

এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী, সমুদায় ত্যাগ করিয়া, নিজ রাজ-

ধানীতে ছিন্ন কাঁথা ও করোয়া মাত্র লইয়া, ঠাকুর মহাশয় পরমানন্দে শ্রীভগবানের ভজন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র, পান ভাল বাসিতেন। ভজনস্থলীতে যাইয়া উহা ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার নিমিত্ত খিলি প্রস্তুত করিয়া মধ্যে মধ্যে লোক দ্বারা পাঠাইয়া দিতেন, আর ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে রামচন্দ্র উহা গ্রহণ করিতেন। রামচন্দ্র আবার সেই লোক দ্বারা তাঁহার স্ত্রীকে চরণ-তুলসী পাঠাইতেন। ঠাকুর মহাশয় জিদ্ করিয়া রামচন্দ্রকে স্ত্রীর কাছে মধ্যে মধ্যে পাঠাইতেন।

ঠাকুর মহাশয়ের এই বড় সুখের দিন, আর সুখের দিন বলিয়া শীঘ্র ফুরাইয়া গেল। এক আশ্চর্য্য এই যে, কি ভগবান, কি তাঁহার ভক্তগণ, সকলেই শেষকালে বিয়োগ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র, ঐরূপে তাঁহার লীলার শেষে সীতা দেবীকে হারাইয়া লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়া আপনি কাঁদুন আর না কাঁদুন, অদ্যাবধি জীবগণকে কাঁদাইতেছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রথমে ব্রজে বিলাস করিলেন, পরে বিরহে বিচ্ছেদেই প্রকট লীলা শেষ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে নবদ্বীপ বিলাস করিয়া, পরিশেষে নীলাচলে অষ্টাদশ বৎসর রোদন করিয়া যাপন করিলেন। ঠাকুর মহাশয়েরও শেষের কাল ঐরূপ। বোধ হয় জীবগণের শিক্ষার নিমিত্ত এইরূপ হইয়া থাকে।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, তাঁহার গুরু গোপাল ভট্ট গোস্বামীর আজ্ঞাক্রমে ও জীব গোস্বামীর প্রীতিতে, মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবন গমন করিতেন। শ্রীজীব গোস্বামী অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে আর একবার দর্শন করিতে আচার্য্য প্রভু বৃন্দাবন চলিলেন, তখন গোপাল ভট্ট গোস্বামী অপ্রকট হইয়াছেন। জীব গোস্বামী ধরাধামে আছেন কি না তাহাও ঠিক জানেন না। বৃন্দাবন তিনি যাইবার ঠিক উদ্যোগ করিয়া

ঠাকুর মহাশয়কে পত্র লিখিলেন যে, তিনি বৃন্দাবন চলিতেছেন। এখন গমন না করিলে হয়তো জীব গোস্বামীর আর দর্শন পাইবেন না। কিন্তু একক তিনি যাইতে পারেন না। যদি রামচন্দ্র সঙ্গে যান, তবেই যাইতে পারেন। অতএব কয়েক মাসের জন্ত যদি ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রকে ছাড়িয়া দেন, তবেই তাঁহার বৃন্দাবনে যাওয়া হয়।

ঠাকুর মহাশয় পত্র পাইয়া ঈষৎ হাসিয়া, উহা রামচন্দ্রকে পড়িতে দিলেন। রামচন্দ্র গুরুদেবের পত্র প্রথমে মস্তকে স্পর্শ করিয়া পরে পড়িলেন। পত্রের মধ্যে গুরুদেব যে বজ্র পাঠাইয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেন না। পত্র পড়িয়া রামচন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। রামচন্দ্র, আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। গুরু শিষ্যে অত্যন্ত প্রণয়। সেই গুরুর সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইবেন। বৃন্দাবন যাওয়া অপেক্ষা বৈষ্ণবদের আর কি সুখ আছে? কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে হইবে, ইহাই মনে করিয়া রামচন্দ্র চারিদিকে আঁধার দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের পিতা, পুত্র, ভগ্নী, স্বামী, স্ত্রী, বন্ধু,—সবই তিনি। ঠাকুর মহাশয়ের তিনি একমাত্র সম্বল। তাঁহার সঙ্গ ব্যতীত ঠাকুর মহাশয়ের পৃথিবীর আর কোন সুখ নাই। ঠাকুর মহাশয়কে ছাড়িয়া গেলে তাঁহার নিজের যে দুঃখ হইবে, তাহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না; কিন্তু তাঁহার বিরহে ঠাকুর মহাশয় কি আর ধরায় থাকিবেন?

রামচন্দ্র নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে যাইতেই হইবে। তিনি যাইবেন না একথা বলিতে পারিতেন; কিন্তু আচার্য্য প্রভু তাঁহার গুরু, তাঁহার আজ্ঞা কিরূপে লঙ্ঘন করিবেন?

তখন ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "রামচন্দ্র! নিত্যধামে যাইবার আর অতি অল্প দিন বাকি আছে। সেখানে আর বিচ্ছেদ

সহিতে হইবে না। আমরা দুইজনে নামে উদাসীন, কিন্তু আমাদের বিষয় বাসনা এখনও যায় নাই। তাহা যদি না হবে, তবে তুমি আমি বিয়োগযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না কেন? আমরা দুই জনেই সংসারী তোমার সংসার আমি, আমার সংসার তুমি। তোমাকে ও আমাকে দিন কয়েক সংসার শূন্য করিয়া রাখিবার প্রভুর ইচ্ছা হইয়াছে। বিরহে দুঃখও আছে, আনন্দও আছে। কিছু দিন স্বতন্ত্র থাকিব, আবার মিলনে সুখ হইবে।

ইহাতে রামচন্দ্র রুক্ষ ভাবে বলিলেন, "ঠাকুর! তুমি আমাকে কি বুঝাইতেছ? ঔদাস্য, সংসার ত্যাগ, ও সমুদায় শুষ্ক জ্ঞানের কথা। আমাদের প্রভু স্বয়ং ঘোর সংসারী। তাঁহার ভক্ত লইয়া সংসার। ব্রজবাসিগণ সকলে সংসারী। সঙ্গী ব্যতীত আমরা কিরূপে ব্রজরস আস্বাদ করিব? প্রভু লোকনাথ ও ভূগর্ভ কি করিয়াছিলেন? তাঁহারা দুইজনে দিব্য সংসার পাতাইয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের অপেক্ষা বড় বৈরাগী জগতে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। বৃন্দাবনে গোস্বামিগণ বৃহৎ সংসার পাতাইয়া সকলে সংসার সুখ অনুভব করিতেন। অবশ্য তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র ছিল না, কিন্তু তাঁহারা সকলে কৃষ্ণের সংসারে একত্রে বাস করিতেন। আমি বলি কি তুমিও সঙ্গে চল, একত্র হইয়া বৃন্দাবনে যাই।"

ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "বৃন্দাবনে আর এখন সুখ কি আছে যে যাইব? আমার প্রভু আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ভূগর্ভও গিয়াছেন। বৃন্দাবনের যত নিধি সমুদায় অদর্শন হইয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী যে প্রকট আছেন, তাহাও বোধ হয় না। তবে কি দেখিতে যাইব? তীর্থ করিতে যাইব না, বলা বাহুল্য। তীর্থ ইত্যাদি মনের ভ্রম, আমি আপনি লিখিয়াছি। রামচন্দ্র, দুঃখ করিও না। বিচ্ছেদ

হইবেই হইবে। একদিন একদণ্ডে কি দুই জনে মরিব না। অতএব পূর্ব্ব হইতেই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা অভ্যাস করা ভাল। আচার্য্য প্রভু এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাকে বৃন্দাবনে একা যাইতে দেওয়া উচিত নয়। এক কাজ করিবে, আমার মাথার দিব্য লাগে; বাড়ী যাইবে, যাইয়া তোমার স্ত্রী, আমার সতীনের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া যাইবে।"

ঠাকুর মহাশয় রহস্য করিতেছেন, কিন্তু রামচন্দ্র বড় অধীর হইলেন, আর তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, "এ পৃথিবীতে আর দেখা হইবে না। এই জন্মের মত বিদায়!"

তখন উভয়ে ঠাকুরের আঙ্গিনায় গমন করিলেন। ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রকে মনে মনে শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে সঁপিয়া দিলেন। আর রামচন্দ্র মনে মনে এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অভাবে ঠাকুর মহাশয়ের কোন দুঃখ না হয় এইরূপ উভয়ে উভয়কে প্রভুর পদে সমর্পণ করিলেন।

রামচন্দ্র, ঠাকুর মহাশয়ের চরণে প্রণাম করিলেন; ঠাকুর মহাশয় তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সর্ব্বসমক্ষে অতি ধৈর্য্য ধরিয়া উভয়ে বিদায় হইলেন।

রামচন্দ্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজের ও আপনার ঘরণীর নিকট বিদায় হইয়া আচার্য্য প্রভুর সহিত বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। আর ঠাকুর মহাশয়, ঠাকুরের আঙ্গিনায় রামচন্দ্রের নিকট বিদায় হইয়া, বরাবর ভজনস্থলীতে গমন করিলেন। সেখানে আর কাহাকেও থাকিতে দিলেন না। তবে গঙ্গানারায়ণ ও রামকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেখানে যাইতেন, যাইয়া নিস্তব্ধে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, যদি তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের কোন কাজে লাগেন। অন্যান্য ভক্তগণ গমন করিয়া শুদ্ধ প্রণাম

করিয়া চলিয়া আসিতেন। ঠাকুর মহাশয় প্রায় বাক্যালাপ ছাড়িয়া দিলেন। রামচন্দ্র গমন করিলে, ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" গ্রন্থ সমাপন করেন। ঐ গ্রন্থের দুইটী পদে ইহা জানা যাইতেছে। যথা:—

রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তাঁর সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুনঃ, তাঁর সঙ্গ হয় যেন,
নরোত্তম তবে হবে ধন্য॥

তখন ঠাকুর মহাশয় আপনাকে একেবারে একক ভাবিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদগণ সকলে অদর্শন হইয়াছেন। বৃন্দাবনের গোস্বামী ভক্তগণ আর ধরাধামে নাই। সঙ্গীদিগের মধ্যে আচার্য্য প্রভু ও রামচন্দ্র, তাঁহারা দূরদেশে। ঠাকুর মহাশয় ঠাকুর-ভজনে আপনার মনকে স্থির রাখিলেন, এবং স্বচ্ছন্দে কয়েক মাস কাটাইলেন। রামচন্দ্রের আসিবার সময় হইতেছে, অদ্য কি কল্য আসিবেন। ঠাকুর মহাশয় ইহাই ভাবিতেছেন, কিন্তু তবু রামচন্দ্র আসিলেন না। আসিবার সময় এক মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবুও রামচন্দ্র আসিলেন না। ঠাকুর মহাশয় ইহাতে একটু চঞ্চল হইলেন। মনে স্থির বিশ্বাস ছিল, কয়েক মাস পরে রামচন্দ্রের সহিত দেখা হইবে। এই আশায় হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরিয়াছিলেন। কিন্তু আসিবার সময় অতীত হইয়া গেল, তবু তাঁহারা কেহ আসিলেন না। এইরূপে ক্রমে দিন যাইতে লাগিল; আর যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই ঠাকুর মহাশয়ের রামচন্দ্রের বিরহ যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। আর কি রামচন্দ্রের সঙ্গ পাব? আর কি আচার্য্য প্রভুর কথা শুনিব? এইরূপ বলিতে বলিতে, দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে, ঠাকুর মহাশয় এই পদটী রচনা করিলেন:—

বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,
হিয়া মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণের রামচন্দ্র ছিল, সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেল,
শুনিতে না পাই মুখের কথা॥
পুনঃ কি এমন হব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব,
এ জনম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক, রামচন্দ্র বলি ডাক,
তবে যদি যায় সেই ভাল॥
স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভট্ট যুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, রামচন্দ্র যার দাস,
পুনঃ নাকি মিলিবে আমারে?
না দেখিয়া তার মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
বিষ শরে কুরঙ্গিনী যেন।
আঁচলে রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল,
নরোত্তমের হেন দশা কেন?

এইরূপে ক্রমে রামচন্দ্রের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবু আচার্য্য প্রভু কি রামচন্দ্র কেহই আসিলেন না। তাহারা কেন আসিলেন না, তাহা পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন; তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়কে একা ফেলিয়া উভয়ই অপ্রকট হইয়াছেন।

এ সংবাদ সকলে শুনিয়াছেন, কিন্তু ঠাকুর মহাশয়কে বলেন নাই। উদ্যোগী হইয়া এ সংবাদ কে তাঁহাকে বলিবে? আবার তিনিও, কাহাকে জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক, কাহার সহিত বাক্যালাপও করেন না। ঠাকুর মহাশয় মনে মনে বুঝিলেন যে, আচার্য্য প্রভু ও রামচন্দ্র

আর পৃথিবীতে নাই ; কিন্তু রামচন্দ্রের তথ্য,—তিনি আছেন না আছেন, ইত্যাদি কথা—কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন না। তাঁহার অনুগত ভক্তগণ কেবল দেখিতে লাগিলেন যে, তাঁহার নয়ন জলের স্রোত শত গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই মাত্র। ঠাকুর মহাশয়ের সেই সময়ের আর একটী গান বলিব। এই পদটি ঠাকুর মহাশয় কারুণ্য-রস মন্থন ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যথা :—

গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীনিবাস গদাধর,
নরহরি, মুকুন্দ, মুরারি।
স্বরূপ, দামোদর, হরিদাস, বক্রেশ্বর,
এ সব প্রেমের অধিকারী॥
করিলা যে সব লীলা, শুনিতে গলায়ে শীলা,
তাহা মুঞি না পাই দেখিতে।
তখন না হল জন্ম, না বুঝিনু সেই মর্ম্ম,
এই শেল রহি গেল চিতে॥
প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট যুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মেলি, কৈয়া কি মধুর কেলি,
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ॥
সবে হৈলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
আঁধল হইল এনা আঁখি।
কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার মুখ,
আছি যেন মরা পশু পাখী॥
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, আছিনু যাঁহার পাশ,
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।

তেঁই মোরে ছাড়ি গেল, রামচন্দ্র না আইল,
দুঃখে জিউ করে আনচান ॥
যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন জল, বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক! ধিক! নরোত্তম দাস ॥

এইরূপে রামচন্দ্রের বিচ্ছেদে, ঠাকুর মহাশয়ের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পূর্ব্বে ঠাকুর মহাশয়ের মনের ক্ষোভ একরূপ ছিল। পূর্ব্বকার মনের ভাব তাঁহার পদ হইতে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত কথা দ্বারা জানা যায়। যথা,—কবে আমার বিষয় বাসনা যাবে? কবে আমাকে রূপ, সনাতন, লোকনাথ কৃপা করিবেন? কবে নিত্যানন্দ ও স্বরূপ আমাকে চরণে স্থান দিবেন? কবে আমার যুগল ভজনে মতি হইবে? কবে গৌরাঙ্গ বলিতে আমার নয়নে জল আসিবে? কবে শ্রীরূপ, মঞ্জরী, সখীগণের ওশ্রীমতীর সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিবেন? কবে সখীগণের আজ্ঞাক্রমে যুগল সেবা করিব? কবে রাধাশ্যাম শয়ন করিলে পদসেবা করিব ইত্যাদি। কিন্তু রামচন্দ্র ও আচার্য্য প্রভুর বিয়োগে এই ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিরহরূপ মহাভাব পাইলেন। তখনকার ভাব তাহার কৃত এই পদ দ্বারা প্রকাশিত হইবে, যথা:—

নব ঘন শ্যাম, ও পরাণ বন্ধুয়া,
আমি তোমায় পাশরিতে নারি।
তোমার সে মুখ শশী, অমিয় মধুর হাসি,
তিল আধ না দেখিলে মরি ॥

তোমার নামেতে আদি, হৃদয়ে লিখিতাম যদি,
তবে তোমায় দেখিতাম সদাই।
এমন গুণের নিধি, হরিয়া লইল বিধি,
এবে তোমায় দেখিতে না পাই॥
এমন ব্যথিত হয়, পিয়ারে আনিয়া দেয়,
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিনু তোরে, পরাণ কেমন করে,
কি কহিব কহনে না যায়॥
এবে সে বুঝিনু সখী, পরাণ সংশয় দেখি,
মনে মোর কিছু নাহি ভয়।
যে কিছু মনের সাধ, বিধাতা পাড়িল বাদ,
নরোত্তম জীবন যাপয়॥

এই গীতটীর উহার মাধুরী সুরের সহিত না শুনিলে, সম্যকরূপে বুঝা যায় না। মনের ভাব বাক্যে যতটুকু ব্যক্ত হয়, সুরে তাহা অপেক্ষা কোটী গুণে হয়।

এই সাধকের শেষ অবস্থা। ইহাকে কৃষ্ণ-বিরহ বলে। প্রথমে নবানুরাগ, অর্থাৎ কৃষ্ণরতি, অর্থাৎ বাসনা। তাহার পরে মিলন, অর্থাৎ তাহার সহিত সহবাস। তাহার পরে বিরহ। এই বিরহ সাধনের সীমা। শ্রীগৌরাঙ্গের শেষ-লীলা দ্বাদশ বর্ষ কেবল কৃষ্ণ বিরহ। কৃষ্ণ-বিরহ ব্যাপার কি, ইহা তিনি আপনি রাধা-ভাবে দ্বাদশ বৎসর ভোগ করিয়া জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রভু, শ্রীভগবান, ঠাকুর মহাশয়কে এই সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় উঠাইবেন বলিয়া, তাঁহার সহিত রামচন্দ্রের বিচ্ছেদ ঘটাইলেন। রামচন্দ্র তাহার সঙ্গে থাকিলে, তিনি কি রামচন্দ্র, কেহই বোধ হয়, এরূপ ভাগ্য পাইতেন না।

সেই রাজপুত্র ভজনস্থলীতে এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, পরিধান ছিন্ন-বস্ত্র, বাম হস্তে গণ্ড রাখিয়া রোদন করিতেছেন। একটু দূরে তাঁহার প্রিয় ভক্তগণ দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছেন। শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, প্রাণ সংশয়। ঠাকুর মহাশয় মুখ তুলিয়া ভক্তগণ পানে চাহিলেন, অমনি গঙ্গানারায়ণ চরণ ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, প্রভু, আপনার এ অবস্থায় কি রূপে জীবন ধারণ করিব?"

ঠাকুর মহাশয় গঙ্গানারায়ণের গলা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। গঙ্গানারায়ণ ও অন্যান্য ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া আবার গঙ্গানারায়ণ বলিতেছেন, "আপনি একবার গাম্ভীলায় আগমন করুন। সেখানে গঙ্গাস্নান করিয়া পরে আবার আসিবেন। আমাদের এই মিনতি রাখিতে আজ্ঞা হয়।"

ঠাকুর মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "চল, তোমার বাড়ী গমন করিয়া কিছুদিন গঙ্গাস্নান করিব।

তখন সকলে মহা আনন্দিত হইলেন। তাহারা ভাবিলেন, স্থান পরিবর্ত্তন করিলে ঠাকুর মহাশয় কিছু সুস্থ হইতে পারিবেন। তখনি সকলে উদ্যোগী হইয়া তাহাকে লইয়া চলিলেন। ঠাকুর মহাশয় ঠাকুরের আঙ্গিনায় গমন করিয়া, ছয় ঠাকুরের নিকট বিদায় হইলেন, ও পদ্মা পার হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রত্যুষে খেতরি ত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্নে বুধুরি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজের বাড়ী উপস্থিত হইলেন।

গোবিন্দ কবিরাজ ও তাহার পুত্র দিব্যসিংহ অগ্রবর্ত্তী হইয়া ঠাকুর মহাশয়কে যত্ন করিয়া গৃহে আনিলেন। গোবিন্দ কবিরাজ রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ। এই বাড়ীতে ঠাকুর মহাশয় প্রথমে রামচন্দ্রকে পাইয়াছিলেন।

যে পিঁড়ায় বসিয়া রামচন্দ্রের সহিত প্রথম তাঁহার কথাবার্ত্তা হয়, ঠাকুর মহাশয় সেই পিঁড়ায় গিয়া বসিলেন। বলা বাহুল্য যে, সেই স্থানে বসিলে, ঠাকুর মহাশয়ের হৃদয়ে রামচন্দ্রের বিরহ-বেদনা আবার প্রবল-রূপে বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তিনি ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন। গোবিন্দ কবিরাজ প্রভৃতি অতি ক্লেশে যদিও ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন, কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের মুখ দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিলেন না; ঠাকুর মহাশয়ও বলিলেন না। এই গোবিন্দ কবিরাজ রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ, বিখ্যাত পদকর্ত্তা। তাঁহার কৃত ঠাকুর মহাশয়ের বন্দনা এই স্থলে দেওয়া গেল :—

জয় জয় রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম,
প্রেম ভকতি মহারাজ।
যা কর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর,
রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ ধ্রু ॥
প্রেম মুকুট মণি, ভূষণ ভাবাবলী,
অঙ্গ হি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন, খেতুড় মহা বৈঠত,
সঙ্গ হি ভকত সমাজ ॥
সনাতন রূপ কৃত, গ্রন্থ ভাগবত,
অনুদিন করত বিচার।
রাধা মাধব, যুগল উজ্জল রস,
পরমানন্দ সুখ সার ॥
শ্রীসংকীর্ত্তন বিষয় রসে উনমত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান।

যোগ দান ব্রত আদি ভয়ে ভাগত,
রোয়ত করম গেয়ান॥
ভাগবত শাস্ত্র জন, যো দেই ভকতি ধন,
তাক গৌরব করু আগ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ॥
অভকত যেহ, দূরহি ভাগি রহুঁ,
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে, দেয়াল ভকতি ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

এই পদে শ্রীনরোত্তম রাজা ও রামচন্দ্র মন্ত্রীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। রাজার বল কি, না ব্রজের উজ্জ্বল রস, অর্থাৎ মধুর রস। ইহাদের শত্রু কে, না যোগ যাগ, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞান-কাণ্ড ইত্যাদি। প্রকৃত কথা, যাঁহারা যুগল রসে উন্মত্ত, তাঁহাদের নিকট পাপ, অপাপ ইত্যাদি অতি ক্ষুদ্র কথা। পিঁড়ায় বসিয়া, ঠাকুর মহাশয়, গোবিন্দ কবিরাজ কি নূতন পদাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা শুনিতে চাহিলেন। গোবিন্দ কবিরাজ কৃতকৃতার্থ হইয়া সেই সমুদয় গীত শুনাইলেন। সে দিবস সেখানে দিবানিশি কীর্ত্তনে যাপন করিলেন। ঠাকুর মহাশয় আসিয়াছেন, এ কথা প্রচার হইয়াছে; দেশ দেশান্তর হইতে বহুতর লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। বহুদিন পরে তিনি লোক-সমাজে আসিয়াছেন; ইহাতে লোকের তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত লালসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সকলেই "ঠাকুর মহাশয়" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। ইহাতে ঠাকুর মহাশয় কৃপার্ত্ত হইয়া সকলকে দর্শন দিলেন। আর সহস্র সহস্র লোকে গগন ভেদিয়া হরি নাম করিতে লাগিল, এবং তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

প্রাতে বুধুরী পরিত্যাগ করিয়া গাম্ভীলায় গঙ্গানারায়ণের বাটীতে সকলে আসিলেন। গঙ্গানারায়ণের পরিবারের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী নারায়ণী ও বিধবা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। ঠাকুর মহাশয় আসিতেছেন, পূর্ব্বে তাঁহারা এ সংবাদ পাইয়াছেন। ঠাকুর মহাশয় ভক্তগণ সঙ্গে করিয়া আসিলে তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। নারায়ণী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুর মহাশয়ের চরণে প্রণাম করিলেন। সেই দিন হইতে গঙ্গানারায়ণের বাড়ী মহোৎসব আরম্ভ হইল। দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিতে লাগিল। গ্রামে গঙ্গানারায়ণের বাড়ী দিবানিশি হরিধ্বনি হইতে লাগিল। গাম্ভীলা, ভদ্রগ্রাম, অনেক ব্রাহ্মণের বাস। তাঁহারা ইহাতে বড় বিরক্ত, ঠাকুর মহাশয়ের উপর তাঁহাদের বড় রাগ, গঙ্গানারায়ণের উপর বড় ঘৃণা। তাঁহাদের বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ দেশ মজাইল। গঙ্গানারায়ণকে উপেক্ষা করিতে পারেন না, যেহেতু তিনি পরম পণ্ডিত, ভাগবতে অদ্বিতীয়, আর কুলীন। ইহাই তাঁহাদের আরো রাগের কারণ। ঠাকুর মহাশয়কে লইয়া গঙ্গানারায়ণ দিবানিশি মহোৎসবানন্দে আছেন, ইহা আর গ্রামস্থ লোকের সহ্য হইতেছে না। তাঁহারা নানাবিধ উৎপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ীর ভিতরে ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ও সংকীর্ত্তনের অনুকরণ করিয়া গঙ্গানারায়ণের বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে নানারূপ গোল করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটী দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। ঠাকুর মহাশয়ের জ্বর হইল। সকলে ইহাতে কিছু চিন্তিত হইলেন। জ্বর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চারি দিবস পরে ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন! সকলে তাঁহাকে খট্টায় শয়ন করাইয়া, কীর্ত্তন করিতে করিতে, গঙ্গানারায়ণের যে ঘাট সেখানে লইয়া গেলেন।

গাম্ভীলার ঘাটে ঠাকুর মহাশয় শয়ন করিয়া আছেন, কাহার সহিত

কথা কহিতেছেন না। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন, দু একটী ঠাট্টাও করিতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি তাঁহাদের গঙ্গানারায়ণের উপর বড় রাগ। পূর্ব্বে, তিনি পণ্ডিত বলিয়া তাঁহাকে সকলে মনে বড় দ্বেষ করিতেন, কিন্তু বিদ্যায় পারিতেন না, দ্বেষ মনেই থাকিত। গঙ্গানারায়ণ শূদ্রের নিকট মন্ত্র লইয়াছেন, এখন সেই রাগের শোধ লইবার সুবিধা পাইলেন। পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা গঙ্গানারায়ণকে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। এখন ঠাকুর মহাশয়ের অন্তিম কাল, ভক্তগণ বিষাদে অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের মনের বেগ শান্তি করিবার এই বড় সুযোগ ভাবিয়া গঙ্গানারায়ণকে বলিতেছেন, "কি গো চক্রবর্ত্তী, তোমার গুরুর বাক্‌রোধ হইয়াছে নাকি? এখন অন্তিম কাল তাঁহার কৃষ্ণনাম করা উচিত। কৈ, মুখ দিয়া ত কোন কথাই বাহির হইতেছে না? ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিলেই এইরূপ দশা হইবে, তাহা আমরা আগেই জানি।"

গঙ্গানারায়ণ বিষাদ-সাগরে মগ্ন। এ কথায় যদিও তিনি মর্ম্মাহত হইতেছেন, কিন্তু কিছু উত্তর করিতে পারিতেছেন না। গাম্ভীলা গ্রামের লোকেরই কেবল এইরূপ ক্রোধ, কিন্তু অন্য স্থান হইতে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন করিয়া সকলেই নীরবে আছেন। কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, কেহ বা থাকিয়া যাইতেছেন। ঠাকুর মহাশয় একেবারে নীরব। এক ভাবে শয়ন করিয়া নয়ন মুদিয়া আছেন। ক্রমে অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। ইহা জানিয়া সকলে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন গঙ্গার ঘাটে তিন দিবস কাটিয়া গিয়াছে। এই হরিনামের মহা কলরবের মধ্যে ঠাকুর মহাশয় লোক-দৃষ্টে দেহত্যাগ করিলেন!

গঙ্গানারায়ণ চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতেছেন। বজ্রাহতের ন্যায়

স্তম্ভিত হইয়া সকলে ঠাকুর মহাশয়কে ঘেরিয়া তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন। গঙ্গানারায়ণ মুখ উঠাইয়া দেখেন, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ দাঁড়াইয়া রহস্য দেখিতেছেন। গঙ্গানারায়ণ মুখ উঠাইলে তাহারা বলিলেন "বেটা যেমন ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিয়াছিল, তেমনি বাক্‌রোধ হইয়া মরিল।" তখন গঙ্গানারায়ণ অচেতনবৎ হইলেন.; ব্রাহ্মণগণের কথায় কোন উত্তর না দিয়া ঠাকুর মহাশয়ের মুখ পানে আবার চাহিলেন; মুখ পানে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; ক্রমে অধীর হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের পদতলে বসিলেন ও চরণে মস্তক স্পর্শ করিয়া অঝোর নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপ রোদন করিয়া তিনি যেন শান্ত হইলেন, এবং তখন যেন কি একটী শক্তি পাইলেন। তাহার বদন তখন আর এক আকার ধারণ করিল। বদন হইতে তেজ বাহির হইতে লাগিল, উহা অতি প্রফুল্ল হইল, আর আনন্দে সর্ব্বাঙ্গ ডগমগ করিতে লাগিল। তখন উপস্থিত সকলকে শুনাইয়া অতি মধুর ও গম্ভীর স্বরে ঠাকুর মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! কত পাষণ্ড উদ্ধার করিয়াছে, এখন এই যে অবোধ ব্রাহ্মণগণ তোমার নিন্দা করিয়া আপনাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে, ইহাদিগের প্রতি করুণা করিয়া ইহাদিগের দণ্ড কর।"

যখন গঙ্গানারায়ণ এইরূপ বলিলেন, তখন সকলে যেন বুঝিলেন, তিনি যে সামান্ত শোক দ্বারা মুগ্ধ হইয়া ইহা বলিতেছেন, তাহা নহে। সকলে বুঝিলেন যে, গঙ্গানারায়ণ যেন দেবাদিষ্ট হইয়াই বলিতেছেন। প্রকৃত তাহাই হইল। কারণ এই কথা বলিবা মাত্র ঠাকুর মহাশয়ের বদনে জীবনের কিছু চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। প্রথমে ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, পরে নিশ্বাস বহিল, ক্রমে সমুদায় অঙ্গ অল্প অল্প কম্পিত হইতে লাগিল, শেষে ঠাকুর মহাশয় নয়ন মেলিলেন। সকলে চিত্রপুত্তলিকার

ন্যায় দর্শন করিতেছেন। কাহারও মুখে কথা মাত্র নাই। শেষে ঠাকুর মহাশয় গঙ্গানারায়ণের দিকে চাহিলেন, ও তাঁহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। গঙ্গানারায়ণ চরণ ছাড়িয়া নিকটে গমন করিলেন। তখন ঠাকুর মহাশয় দক্ষিণ হস্তে তাঁহার গলা ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। যথা নরোত্তম বিলাসে :—

গঙ্গানারায়ণের এই ব্যাকুল বচনে।
নিজ দেহে মহাশয় আইল তখনে॥

গাম্ভীলায় ব্রাহ্মণগণ সমুদায় দেখিতেছেন। দেখিয়া তাঁহারা তিতিক্ষায় ও ভয়ে অভিভূত হইলেন। তাঁহারা সাহসে নির্ভর করিয়া ও দ্বেষে চালিত হইয়া ঠাকুর মহাশয়কে নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু এখন তিনি মরিয়া বাঁচিয়া উঠিলেন দেখিয়া, সকলে ভয়ে জড়সড় হইয়াছেন। ঠাকুর মহাশয়কে তদ্দণ্ডেই তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহারা যাবতীয় গালি দিয়াছেন। যেই তিনি উঠিয়া বসিলেন, অমনি তাঁহারা জানিলেন যে, নরোত্তম ব্রাহ্মণ নহেন বটে, কিন্তু মহাপুরুষ। তাঁহারা আরও ভাবিলেন যে, ঠাকুর মহাশয় যে দেহে আসিলেন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত!

ব্রাহ্মণগণ তখন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আপনা আপনি বিবাদ করিতে ও পরস্পরের দোষ দিতে লাগিলেন। কিন্তু এ কথা গঙ্গানারায়ণ, রামকৃষ্ণ কি ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গী ভক্তগণে কেহ কিছু শুনিতেছেন না। তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়কে ঘেরিয়া তাঁহার মুখ দেখিতে ও আনন্দ অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর মহাশয় তখন মৃদু হাসিয়া গঙ্গা-স্নান করিবেন, ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আর গঙ্গানারায়ণ ও রামকৃষ্ণের স্কন্ধে ভর দিয়া গঙ্গায় অবগাহন করিলেন, করিয়া গৃহে আসিতে লাগিলেন।

অন্যান্য ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া কেহ নৃত্য, কেহ হরিধ্বনি করিতে করিতে সঙ্গে চলিলেন। নারায়ণী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া চরণে প্রণাম করিলেন ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তোমরা শীঘ্র যাও, কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর, বড় ক্ষুধা হইয়াছে। তখন মহা আনন্দে সকলে ঠাকুর মহাশয়কে লইয়া মিষ্টান্ন ভোজন করিলেন।

এ দিকে গ্রামে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত। কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুর মহাশয়ের কোপে তাঁহার পুত্রটি মরিবে; কেহ ভাবিতেছেন, তাঁহার কুষ্ঠ-রোগ হইবে; আর যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, সাধু-নিন্দা অপরাধে বহুজন্ম নরকভোগ করিতে হইবে। তখন সকলে দলবদ্ধ হইয়া গঙ্গানারায়ণের বাড়ী আসিলেন ও তাঁহাকে অন্তরালে ডাকাইয়া আনিলেন। গঙ্গানারায়ণ আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন যে, গ্রামস্থ সমস্ত ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ীর এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহা-দের মধ্যে যাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের বড় বিদ্বেষী, তাঁহারাও আছেন। গঙ্গানারায়ণ আসিলেই সকলে কাকুতি করিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন, আর বলিলেন, "তুমি আমাদের গ্রামস্থ, তোমার নিকট যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করিয়া, যাহাতে ঠাকুর মহাশয়ের কৃপা পাই, তাহা করিয়া দাও। আমাদের কুমতি হইয়াছিল, এখন তাহা গিয়াছে। আমরা এখন বুঝিতে পারিলাম যে, যে ভগবানের কৃপার পাত্র, সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তোমরা সকলে ভক্ত, অতএব পরম দয়াল, এখন আমা-দিগকে উদ্ধার করিয়া কীর্ত্তি স্থাপন কর।"

গঙ্গানারায়ণ এই সব কাণ্ড দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মনে প্রতীতি হইল যে, এ সমুদায় কাণ্ড কেবল তাঁহারই সুখের নিমিত্ত হইতেছে। তিনি ভাবিলেন যে, গ্রামস্থ লোক-সমাজ তাঁহাকে

বড় দুঃখ দিত, আর তাহার দুঃখ অপনয়ন করিরবার নিমিত্ত ঠাকুর মহাশয় এ সকল ভঙ্গী করিয়াছেন। তখন গঙ্গানারায়ণ, ব্রাহ্মণগণকে ঠাকুর মহাশয়ের অগ্রে লইয়া গেলেন, যাইয়া ঠাকুর মহাশয়কে জানাইলেন যে, তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহার গ্রামস্থ; ইহারা ব্রাহ্মণ, অনেকে মহা পণ্ডিতও বটেন, তাঁহারা কৃপাপ্রার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন। এই কথা বলা হইলে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঠাকুর মহাশয়ের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন!

ঠাকুর মহাশয় তখন সরল ভাবে প্রতি জনকে আলিঙ্গন দান করিলেন। তাহার পরে, মধুর ভাষায় বলিলেন যে, "গঙ্গানারায়ণ এখন গৃহে কিছু কাল থাকিবেন। তাঁহার নিকট তোমরা ভক্তি-গ্রন্থ পাঠ কর। পরে যাহার ইচ্ছা হয়, তাহার সহিত খেতরি গমন করিবে।"

পরে ঠাকর মহাশয় খেতরি প্রত্যাগমন করিলেন। গঙ্গানারায়ণের গ্রামে বড় দুঃখ ছিল। গ্রামস্থ লোক তাঁহাদিগকে, বিশেষতঃ তাঁহার ঘরণী ও কন্যাকে, বড় উৎপীড়ন করিত। একে তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর ঠাট্টা দ্বেষ মিশাইয়া নানা উপায়ে গ্রামস্থ লোকে তাঁহাদিগকে যন্ত্রণা দিত। এখন ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় সমস্ত দূরীভূত হইল।

তাহার পরে গঙ্গানারায়ণ, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে খেতরি উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর মহাশয় সকলকেই আলিঙ্গন দান করিয়া মন্ত্র-দীক্ষা দিলেন।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার গৌরাঙ্গদাসদিগের এক প্রধান কার্য্য। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের বিরোধী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। ব্রাহ্মণগণ বলেন, বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ। গৌর ভক্তগণ বলেন, যিনি ভক্ত তিনি গুরু। সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণগণের অভিমানের বিরোধী। বৈষ্ণবগণ বলেন যে, সেই ব্রাহ্মণ, যে ভগবানের দাস। তাঁহারা আরো বলেন যে, ভক্ত যদি চণ্ডাল

হয়, তবু সে অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে সমাজের শুধু উপকার আছে তাহা নয়, ইহা প্রচারিত হইলে সমাজ জীবিত থাকিবে, নতুবা হিন্দুকুল বিলুপ্ত হইবে। বৈষ্ণব ধর্ম্মে জাতিবুদ্ধি নাই।

ঠাকুর মহাশয়ের শেষাবস্থা।

—:*:—

তখন ঠাকুর মহাশয় আর লোকের সহিত কথা কহিবার অবকাশ পান না। বিরলে, নির্জ্জনে, হা হুতাশ করে দিন যাপন করেন। কখন বা ঠাকুরের আঙ্গিনায় বসিয়া রোদন করিতেছেন, ধূলায় ধূসরিত; শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ পানে চাহিয়া মনে মনে কি বলিতেছেন, আর নয়নজলে মুখ ভাসিয়া যাইতেছে। ভক্তগণ সকলে দূরে দাড়াইয়া সজল-নয়নে দর্শন করিতেছেন। কখন বা করযোড়ে স্তব করিতেছেন। "হে শ্রীগৌরাঙ্গ! আমাকে চরণে স্থান দাও। আমি কি তোমার চরণ পদ্ম পাইব? আমি কি তোমার পার্ষদগণকে দর্শন পাইব? আমার কি তোমার শ্রীচরণে মতি হইবে? হে শ্রীগৌরাঙ্গ আমি অতি দুর্ব্বল হইয়াছি। আর আমি তোমাকে ভজন করিতে পারিতেছি না। আমি অতি শক্তিহীন। যে সব সাধুসঙ্গ বলে আমি তোমার ভজন করিতে পারিতাম, তাঁহারা সকলে অদর্শন হইয়াছেন। আমি এখন তোমা ছাড়া আর কাহাকে মনোবেদনা বলিব?"

সেই নবীন রাজকুমার, পিতা মাতার আদরের ধন, আজ জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীন। আজ অতি যে দীন, সেও তাহার দশা দেখিয়া রোদন করিতেছে।

এক দিবস ঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে, তিনি গাম্ভীলায় যাইবেন। ইহাই বলিয়া যেন সম্পূর্ণ চেতন পাইলেন। তখন মহাব্যস্ত হইয়া আগ্রহের সহিত ঠাকুর সেবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। খেতরীতে

তাঁহার যে যে কার্য্য ছিল, সমুদায় সম্পন্ন করিলেন, করিয়া ঠাকুর আঙ্গিনায় আসিলেন। প্রত্যেক ঠাকুরের নিকট গমন করিয়া বিদায় হইতে লাগিলেন। প্রত্যেক ঠাকুরের নিকট কিছুকাল থাকিয়া মনে মনে স্তব করিলেন। পরে ভূমণ্ডলের সমস্ত জীবগণকে ঠাকুরের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। "প্রভু! দীনবন্ধু! জীবের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত কর।" ইহাই বলিয়া আঙ্গিনায় সাষ্টাঙ্গে ঠাকুরকে আবার প্রণাম করিলেন।

সকলে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, ঠাকুর মহাশয়ের কি এই শেষ বিদায়! ঠাকুর মহাশয় কিন্তু অতি প্রফুল্ল। তিনি সকল ভক্তের নিকট বিদায় লইলেন, ও সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গ্রামের সকলেই তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিলেন। সঙ্গে কেবল নিজ জন মাত্র চলিলেন। এইরূপে আবার বুধুরী গ্রামে গোবিন্দ কবিরাজের বাড়ী আসিলেন। গোবিন্দ কবিরাজ কৃতার্থ হইয়া প্রণাম করিলে, ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "আমাকে কীর্ত্তন-মঙ্গল শুনাও"। আমি তাহাই শুনিতে তোমার এখানে আসিয়াছি।" এইরূপে সারা নিশি কীর্ত্তনানন্দে কাটিয়া গেল।

পর দিবস তিনি গাম্ভীলায় আসিলেন। ঠাকুর মহাশয় আসিলে, নারায়ণী ও বিষ্ণুপ্রিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের সহিত ক্ষণকাল মিষ্ট আলাপ করিলেন। এমন সময় গ্রামস্থ সকলেই আসিলেন। এবার আর তাঁহাদের পূর্ব্বকার ভাব নাই। ঠাকুর মহাশয়কে পাইয়া তাঁহারা সকলে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন। ঠাকুর মহাশয় সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে নিজ জন সঙ্গে গঙ্গা-স্নান করিতে চলিলেন।

কার্ত্তিক মাস, কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথি। ঠাকুর মহাশয় অবগাহন করিয়া গঙ্গাতীরে আধ-গঙ্গা জলে বসিলেন, ও গঙ্গানারায়ণ ও রামকৃষ্ণ,

এই দুই জনকে অঙ্গ-মার্জ্জন করিতে বলিলেন। একজন দক্ষিণে, অপর জন বামে বসিয়া অঙ্গ-মার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অঙ্গ-মার্জ্জন করিতেই এক অদ্ভূত কাণ্ড উপস্থিত হইল। যথা নরোত্তম বিলাসে :—

দেহে কিবা মার্জ্জন করিবে, পরশিতে
দুগ্ধ প্রায় মিশাইলা গঙ্গার জলেতে।
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হৈল অন্তর্ধান।
অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহা কে বুঝিবে আন॥
অকস্মাৎ গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল।
দেখিয়া লোকের মহা বিস্ময় হইল॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে দেখি সঙ্গোপন।
বরিষে কুসুম স্বর্গে রহি দেবগণ।
চতুর্দ্দিকে হইল মহা হরি হরি ধ্বনি।
কেহ ধৈর্য্য ধরিতে না রহে ইহা শুনি॥

এরূপ সঙ্গোপন এখন লোকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু শুনিতে পাই, অনেক ভক্ত এইরূপে পরলোকে গমন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কথা এখানে বলিব না, কারণ তিনি স্বয়ং ভগবান, কিন্তু তবু ঈশ্বর আপনার নিয়ম আপনি লঙ্ঘন করেন না। তাহার পরে ঠাকুর নরহরি, রসিকানন্দ, তুকারাম প্রভৃতি সকলে এইরূপ অলৌকিকভাবে অপ্রকট হয়েন।

সে যাহা হউক অদ্য আমাদের ভাগ্য ফুরাইল। পরম সুখে যে ঠাকুর মহাশয়ের কথা লিখিতেছিলাম, অদ্য হইতে সে সুখে বঞ্চিত হইলাম। আমার বড় বাসনা ছিল যে, নয়ন-জলের কালি দিয়া ঠাকুর মহাশয়ের লীলা-খেলা বর্ণনা করিব। তাহা পারিলাম না, তবে নয়ন জলে উহা সমাপ্ত করিলাম।

গঙ্গানারায়ণ, ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে গঙ্গায় প্রবেশ করিতে চলিলেন,

কিন্তু সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাড়ী আনিলেন গৃহে নারায়ণী ও বিষ্ণুপ্রিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, ও গাম্ভীলা গ্রামে শোক-কলরব উঠিল। গ্রামে প্রত্যেক গৃহে আবাল বৃদ্ধ বনিতা রোদন করিতে লাগিলেন। গ্রামস্থ লোকে "কি হলো কি হলো" বলিয়া গঙ্গা-নারায়ণের বাড়ী আসিলেন। গঙ্গানারায়ণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছেন, কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। গ্রামের রমণীগণ অন্তঃপুরে নারায়ণী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

দাবানলের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে এই কথা দেশময় প্রচারিত হইল বুধুরী হইতে গোবিন্দ কবিরাজ, ও খেতরি আদি স্থান হইতে ভক্তগণ দৌড়িয়া আসিলেন। গঙ্গানারায়ণ যথা সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করিয়া মহোৎসব করিলেন।

সেখান হইতে সকলে একত্র হইয়া খেতরি গমন করিলেন, রাজা রূপনারায়ণ, চাঁদ রায়, নরসিংহ, প্রভৃতি সকলে জুটিয়া সেখানে মহোৎ-সব আরম্ভ করিলেন। সে মহোৎসবের ন্যায় বৃহৎ ব্যাপার অদ্যাপি কোথাও হয় নাই। মহা মহা সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, দেবীদাস, গোকুল দাস, গৌরাঙ্গদাস, ফাগু চৌধুরী, জয়নারায়ণ ঘোষ, গন্ধর্ব্ব রায়, রূপ রায়, প্রভৃতি ভুবন বিখ্যাত বায়ন ও কীর্ত্তনীয়াগণ কীর্ত্তন-মঙ্গল উঠাইলেন। ইহারা সকলেই ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। ইঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের কৃত পদ গাহিয়া মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শুনা যায় যে, ঠাকুর মহাশয় সেই আকর্ষণে স্বয়ং আসিয়া কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছিলেন।

গঙ্গানারায়ণ অপুত্রক, সেই নিমিত্ত রামকৃষ্ণ, তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ-চরণকে, তাঁহাকে দিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী তাহাকে গৃহে রাখিয়া, বিধবা কন্যা ও ঘরণীকে লইয়া, ঠাকুর মহাশয়ের শোকে দেশেতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। পিতা মাতার বিয়োগের পর বিষ্ণু-

প্রিয়া রাধাকুণ্ডে বাস করেন, ও তাঁহার চরিত্রে তিনি ভুবনের আরাধ্য হন।

গঙ্গানারায়ণের রাধারমণ ঠাকুর, শুনিতে পাই এখন গাম্ভীলার নিকট বালুচরে গোকুলানন্দ গোস্বামীর গৃহে আছেন।

আমাদের আর অধিক কিছু বলিবার নাই। ঠাকুর মহাশয়ের বংশীয় আর কেহ নাই। একটী বিধবা স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনিও কয়েক বৎসর হইল সংগোপন হইয়াছেন। কার্ত্তিক কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে এখন খেতরীতে মেলা হইয়া থাকে। বহুতর বৈষ্ণব সেখানে যাইয়া থাকেন। ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার অতি বৃহৎ। রাজসাহী, মালদহ, বহরমপুর রঙ্গপুর, পাবনা, প্রভৃতি স্থান ঠাকুর মহাশয় উদ্ধার করিয়াছিলেন। অধিক কি মণিপুরের রাজারা তাঁহার পরিবার। ইঁহারা পূর্ব্বে যাহাই থাকুন, ঠাকুর মহাশয়ের পূর্ব্বে ইঁহারা বর্ব্বরজাতি মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। এখন শ্রীগৌরাঙ্গ সে দেশের উপাস্য-দেবতা, আর ঠাকুর মহাশয়ের নাম করিলেই সকলে প্রণাম করেন। খেতরির মেলাতে এখনও বিশ পঁচিশ সহস্র লোক সমবেত হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে পাঠক! একবার সেখানে যাইয়া স্থানটী দেখিয়া আসিবেন, আর যদি পারেন, তবে সেই স্থানের ধূলা অঙ্গে মাখিবেন; এই তিন শত বৎসর সহস্র সহস্র লোক, প্রতি বৎসর, খেতরি যাইয়া নরুর গুণ-কীর্ত্তন করিতেছেন। নরু রাজকুমার থাকিলে কে তাহা করিত?

রামচন্দ্র ও শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর সঙ্গোপনের পর, ঠাকুর মহাশয় অধিক কাল জীবিত ছিলেন না। তাহার প্রমাণ আচার্য্য প্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য ও উপরি উক্ত প্রভুগণের পার্ষদ বল্লভ দাসের পদে প্রকাশ, যথা:—

প্রভু শ্রীআচার্য্য, প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয়।
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেম রস-ময়॥

এ সব ঠাকুর সঙ্গে পারিষদগণ।
উজ্জ্বল ভকতি কথা করিনু শ্রবণ॥
বৈষ্ণবের তুলা মেলা নানাবিধ দান।
পরিপূর্ণ প্রেম সদা কৃষ্ণ-গুণ গান॥
এক কালে কোথা গেলা না পাই দেখিতে।
দেখিবার দায় রহু না পাই শুনিতে॥
উচ্ছিষ্টের কুকুর মুই আছিনু সেখানে।
যখন যে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে॥
শুনিতে স্বপন হেন কহিতে কাঁহা কথা।
ভিটা সঙরিয়া কুকুর কান্দে এমতি আছে কোথা॥
বল্লভ দাসের হিয়ার শেল রহি গেল।
এ জনমে হেন বুঝি বাহির না ভেল॥

স্বপ্ন।

—*—

ঠাকুর মহাশয় দেখিতে কিরূপ, তাহা জানিবার নিমিত্ত অনেক গ্রন্থ অনুসন্ধান করি ; কিন্তু ভক্তের বর্ণনা ব্যতীত স্বাভাবিক বর্ণনা কোথাও পাইলাম না। আমি যখন এই বিষয় লইয়া বড় ব্যস্ত, তখন আমার অভিন্ন কলেবর, শ্রীবলরাম দাস, তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই স্বপ্ন দেখিয়া মনে নিশ্চিত প্রতীতি হইল যে, আমার এই পুস্তকের নিমিত্ত তিনি এই স্বপ্ন দেখিয়াছেন। এই জন্য, আমি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিব বলিয়া, তিনি তাঁহার স্বপ্ন বৃত্তান্তটী সমুদায় আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন যথা :—

"আমি রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছি, নিদ্রা যাইতেছি, রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, এমন সময় দেখি যে ঠাকুর মহাশয় আসিয়াছেন, আর তাঁহার সমভিব্যাহারে আরও তিনজন আসিয়াছেন। এই তিন জন সঙ্গী, ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইলেন, আর তিনি আমার অগ্রে আসিলেন। এইরূপ ভাব যেন তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আসিয়াছেন মাত্র, তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই। এই তিন জন কে তাহা জানি না, তবে যেন ঠাকুর মহাশয় আমাকে ইঙ্গিত দ্বারা জানাইলেন যে, তাহার মধ্যে একজন, পদকর্ত্তা শ্রীবলরাম দাস। আমার বোধ হইল, যেন তিনিও "মিতা" বলিয়া অতি অস্ফুট স্বরে আমাকে সম্বোধন করিলেন। শ্রীবলরাম দাস ঠাকুরের মুখ

সুগোল মস্তক মণ্ডিত, বয়ঃক্রম পঞ্চাশ, অনেকটা বৈদ্যনাথের পন্ধা ঠাকুরের মত।

কিন্তু বলিতে কি, আমার মিতা ঠাকুরের দিকে আমি বড় দৃষ্টি করিতে পারিলাম না। আমার সমুদায়খানি প্রাণ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি যে ঠাকুর মহাশয়, তাহা আমি কিরূপে জানিলাম, তাহা বলিতে পারি না।

ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম আন্দাজ চল্লিশ, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, ও দেহ অতি ক্ষীণ। যেন উপবাস করিয়া দেহ শুখাইয়া গিয়াছে। পরিধান কৌপীন নহে, একখানি পল্লীগ্রামস্থ সেকালের মোটা ধুতি, স্কন্ধে সেই রূপ একখানি চাদর, গলায় তুলসীর মালা।

দেখিলাম ললাট অতি প্রসর ও দন্তগুলি একটু বড়, কথা বলিতে দন্ত দেখা যায়। যখন কথা কথা বলেন তখন যেন হাসিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত হাসিতেছেন না। ঠাকুর মহাশয়ের পরিধান যে কেন কৌপীন নহে, তাহার কারণ মনে মনে এই বুঝিলাম যে, কৌপীনের উপর আমার একটা স্বাভাবিক ঘৃণা আছে। তাই তিনি পল্লীগ্রামের ভদ্রবেশে আমাকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত; চরণে পড়িব, কিন্তু সাহস হইতেছে না। কারণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার প্রেমের উদয় হয় নাই; আমার মনের এই ক্ষোভ তখন এমন প্রবল হইয়াছে যে, আমি ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন করিলাম আর আমার প্রেমের উদয় হইল না? ধিক্ আমাকে!

ঠাকুর মহাশয় যেন আমার মনের ভাব বুঝিয়া আমাকে বলিতেছেন, "এখন অধিক রাত্রি হইয়াছে, তুমি চঞ্চল হইও না। এই কথা বলিলে আমি তখন কাতর হইয়া তাঁহার চরণে পড়িতে গেলাম কিন্তু ঠাকুর মহা-

শয় তাহা পড়িতে দিলেন না। তিনি আমাকে দুই বাহু দিয়া ধরিয়া হৃদয়ে করিলেন, আর বলিলেন, "তুমি আমার চরণ কেন ধরিবে, আমার হৃদয়ে আইস, তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি পবিত্র হই।"

এই দৈন্যোক্তি করিয়া ঠাকুর মহাশয় আমাকে বুকে করিলেন। তাঁহার হৃদয় আমার হৃদয়ে সংলগ্ন হইল, আর আমার যেন চেতনা গেল; ঠাকুর মহাশয়ও যেন একটু বিহ্বল হইলেন, আর সেই অবকাশে আমি তাঁহার চরণে পড়িলাম।

ঠাকুর মহাশয় একটু বিহ্বল আছেন বলিয়া হউক, কি আমাকে কৃপা করিবেন বলিয়া হউক, চরণখানি সরাইলেন না। আমি তখন দুই হাত দিয়া ধরিয়া একখানি চরণ তল দেখিতেছি। দেখি কি, যেন পদ্মপুষ্পের দল! ঐরূপ কোমল ও ঐরূপ রাঙ্গা। আমি মোহিত হইয়া চরণপদ্ম দেখিতেছি, ঠাকুর মহাশয় কিছু বলিতেছেন না, যেন বিহ্বল অবস্থায় আছেন। এমন সময় দেখি, পদতলে কয়েকটি রেণু আছে। তখন যেন কেহ আমাকে বলিয়া দিলেন যে, ঐ রেণুগুলি তোমার প্রতি করুণা উহাতে তোমারই অধিকার। এই কথা শুনিয়া আমি উবুড় হইয়া জিহ্বা দ্বারা পদ হইতে ঐ রেণুগুলি লেহন করিয়া লইলাম। ঠাকুর মহাশয় বিহ্বল হইয়া আছেন, কোন কথা বলিতেছেন না।

পরে বোধ হয় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আমাকে অনেক কথা, তাহার প্রায় সমুদায় আমি ভুলিয়া গিয়াছি। আমার স্মরণ হয়, তিনি আমাকে বলিলেন যে, এ সমুদায় কথা তোমার প্রয়োজন মত মনে হইবে। শেষে আমাকে বলিলেন, "অনেকক্ষণ আসিয়াছি, আমি যাই।" ইহাই বলিতে বলিতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। অমনি আমি জাগিয়া বসিলাম।

দেখিলাম এক অদ্ভুত কাণ্ড! স্বপ্ন নয় তাহা বুঝিলাম। ঠাকুর মহাশয় যে সকল কথা বলিয়াছেন, তখন সে গুলি কর্ণের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ

করিতেছে। আমি এত আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইলাম যেন সহজ জ্ঞান লোপ হইবার ম্লো হইল। তখন নিকটে অন্য ঘরে, যিনি শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে ডাকিলাম। তিনি আসিলেন, আমাকে একটু সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন, আর আনন্দে সমস্ত নিশি কাটাইলাম!

নূতন কথা।

নরোত্তমচরিত যখন প্রথমে লেখা হয়, (সে বহুদিনের কথা), তখন তাঁহার লীলা-কাহিনী যেখানে যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা সংগৃহীত করা হইয়াছিল। তখন "শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ" গ্রন্থ আমার পড়া হয় নাই। এই গ্রন্থ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভক্ত ঈশান-নাগরের লেখা। ইনি মহাপ্রভুর শ্রীপদ সেবা করিয়াছিলেন, সেই ভাগ্যে ধন্য। কিরূপে তাঁহার এ ভাগ্য হয়, সেই ভাগবত-কথা শ্রবণ করুন। শ্রীঅদ্বৈতের আকিঞ্চনে মহাপ্রভু তাঁহার নীলাচলের বাসায় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। মহাপ্রভু আসনে বসিলে ঈশান তাড়াতাড়ি পা ধোয়াইতে আসিলেন। প্রভু সঙ্কুচিত হইলেন, হইয়া বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ, দেবতা, আমার পা ধোয়াইয়া আমাকে অপরাধী করিও না।" এই কথা শুনিয়া ঈশান মর্ম্মাহত হইলেন, হইয়া তদ্দণ্ডে উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, আর কান্দিতে লাগিলেন। তখন অদ্বৈত একটু ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "ঈশান, করিলে কি? ব্রাহ্মণের উপবীত শূন্য হইয়া থাকিতে নাই। ধর, উপবীত ধর।" ইহা বলিয়া তাঁহার হস্তে অন্য উপবীত দিতে গেলেন।

ঈশান তখন অতি কাতর ভাবে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "এই উপবীত আমার মহাপ্রভুর পদসেবার বিরোধী, অতএব উহাতে আমার প্রয়োজন নাই।" শ্রীঅদ্বৈত তখন প্রভুকে অনেক বিনয় করিয়া বলিলেন, "ঈশান বড় দুঃখ পাইয়াছে, তাহার সাধ পুরাইতে দাও।" মহাপ্রভু কিছু বলিলেন না, মস্তক অবনত করিলেন; তখন শ্রীঅদ্বৈত চক্ষু ঠারিয়া ঈশানকে মহাপ্রভুর পদ ধৌত করিতে বলিলেন। ঈশান

আনন্দে শ্রীপদ দুখানি ধরিলেন। ঈশান সেই দুইটী পদের এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন, যথা :—

"গৌর রাঙ্গা পাদপদ্ম অতি সুকোমল।"

সে যাহা হউক, কুলশীল না ত্যজিলে শ্যামচাঁদ কখন মিলে না, শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপদেশ যে সত্য, ঈশান আপন ভাগ্যবলে তাহা দেখাইয়াছিলেন। এই উপবীত ছিল তাঁহার কুলশীল।

তাঁহার গ্রন্থে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর কথা কিছু কথা লেখা আছে। তাহার সহিত এই গ্রন্থে লিখিত কাহিনীর কিছু অমিল আছে, তাহা এখানে বলিয়া রাখা উচিত। ঈশান বলেন যে, পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি অদ্বৈতের শিষ্য ছিলেন, তাঁহাকে সকলে "যশোরিয়া" বলিত। ইহার কারণ এই যে, তাঁহার বাড়ী যশোহর জেলার তালগড়িয়া, কি তালখড়ি গ্রামে ছিল। তাঁহার পুত্র লোকনাথ, তিনিও অদ্বৈতের নিকট পড়িতে আসিলেন। সেখানে মহাপ্রভু কিছুকাল বেদ পাঠ করেন, সুতরাং লোকনাথ তাঁহার সহিত কিছুকাল একত্র পড়া শুনা করেন। যখন মহাপ্রভু পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করেন, তখন তাঁহার সহিত লোকনাথ ছিলেন। লোকনাথ মহাপ্রভুকে গণসহ নিজগৃহে লইয়া যান। পদ্মনাভের সহিত যদিও মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আলাপ ছিল না, তবু তাঁহাকে ও তাঁহার গণকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহার গৃহে লইয়া আসিলেন।

পদ্মনাভ, (যথা অদ্বৈত-প্রকাশে)—

আগুলিয়া আইল ত্বরা বস্ত্র বান্ধি গলে।
গৌরাঙ্গ দেখিয়া তিঁহ চিনে অবহেলে॥
দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে মহাপ্রভুর আগে।
বিষ্ণু বিষ্ণু বলি গৌর যায় অন্য দিগে॥

পদ্মনাভ কহে গৌর না ভাণ্ডিহ মোরে।
তোর গূঢ় তত্ত্ব স্থিতি ভক্তের অন্তরে॥
তুমিহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সর্ব্ব-রস-পূর্ণ।
জীব নিস্তারিতে স্বয়ং হইলে অবতীর্ণ॥

* * * *

পদ্মনাভ তারে সৎকার কৈলা বিধিমত।
মহাপ্রভু তথি বাস কৈলা দিন কত॥
নিমাই পণ্ডিত আসিলা হইল মহাধ্বনি।
পণ্ডিতের গণ আইলা আর যত জ্ঞানী॥

* * * *

মহা কোলাহল হৈলা গৌর দেখিবারে।
যুক্তি করি গোরা উঠে অট্টালিকাপরে॥

* * * *

রাত্রে মহা সভা কৈলা মিলি বিজ্ঞগণ।
চতুর্দ্দিকে দীপ জ্বলে যৈছে মণিগণ॥
শিষ্যগণ লঞা গৌর সভাতে আসিলা।
দেখি সবে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান কৈলা॥

তখন মহাপ্রভুর পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালাপ হইল, তাহাতে তাঁহারা সেই অষ্টাদশবর্ষীয় বালক-অধ্যাপকের বিদ্যা দেখিয়া বলিলেন যে "শুনিয়াছিলাম নিমাই পণ্ডিতের বিদ্যা দৈববলে; তাহা অদ্য স্বচক্ষে দেখিলাম।"

৩। এই স্থানটীতে, ঘেরার ভিতরস্থ শ্রীমন্দিরে চারিটী প্রকোষ্ঠ থাকিবে। এক প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ বিগ্রহ থাকিবেন। আর এক প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী থাকিবেন। আর এক প্রকোষ্ঠে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাস থাকিবেন। অন্য প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শ্রীশ্রীশচীমাতা, শ্রীগৌরগোপাল ও শ্রীবিশ্বরূপ থাকিবেন। শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

৪। এই স্মৃতিরক্ষার স্থানটী স্বাস্থ্যকর, মনোরম এবং শান্তিপ্রদ। স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে এখানে কেহ বাস করিতে চাহিলে তাহারও বন্দোবস্ত করা হইবে।

৫। এই ঘেরার ভিতর শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের জন্য সুবৃহৎ একটী মন্দির, কীর্ত্তনাদি করিবার জন্য বৃহৎ নাটমন্দির, ইন্দারা, ফুলের বাগান, আগন্তুকদিগের বাসগৃহ ইত্যাদি নির্ম্মাণ জন্য প্রায় ৩০।৪০ হাজার টাকার আবশ্যক। ভক্তদিগের সৎকার্য্যে দানশীলতার একমাত্র ভরসায় এই গুরুতর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব প্রচারিণী সভার কোন একটী ভদ্র মহিলা, দৈনিক বিগ্রহ সেবার জন্য ৪০ বিঘা ফসলী জমি দান করিয়াছেন। আশা করি, অন্যান্য ভক্তগণ আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

এই স্মৃতি-মন্দির সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী, ১১নং অপার সারকিউলার রোড কলিকাতা, এই ঠিকানায় অবগত হইবেন। যিনি যে সাহায্য প্রদান করিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং অমৃতবাজার পত্রিকা ও বসুমতি প্রভৃতি পত্রে স্বীকার করা হইবে।

শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম (বৃন্দাবন)।
(রাজর্ষি) শ্রীগোপালচন্দ্র আচার্য্য (মুক্তাগাছা)।
শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী।
শ্রীকুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্ন (নবদ্বীপ)।
(রাজা) শ্রীমনিলাল সিংহ রায় (চকদিঘি)।
(রায় বাহাদুর) শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী (সেরপুর)।
(রায়) শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, (বরাহনগর, কলিকাতা)।
(রায় বাহাদুর) শ্রীযদুনাথ মজুমদার (যশোহর)।

শ্রীমন্মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের

স্মৃতি স্থাপনের প্রস্তাবনা।

—— ※ ——

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেরই নিকট মহাত্মা শিশিরকুমার সুপরিচিত। একদিকে যেমন রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নেতা ছিলেন, অন্যদিকেও তেমনই ধর্ম্মনীতিতে ভারতবাসীর নিকট তিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাজ প্রকাশ্য সভাতে বলিয়াছেন "আমি মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে শিক্ষাগুরুস্থানে তাঁহার পদতলে বসিয়া রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছি"। এই উক্তিতেই অতি স্পষ্টভাবে জানা যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শিশির কুমার ভারতের কত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। আর ধর্ম্মজগতে তিনি কোন্ স্থানের যোগ্য অধিকারী, তৎপ্রণীত গ্রন্থাদিই তাহার প্রমাণ। এই মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতি-মন্দির, বর্ত্তমান শ্রীনবদ্বীপ সহরের উত্তরদিগ্বর্ত্তী ভাগীরথী তীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি প্রাচীন মায়াপুর গ্রামে স্থাপনের যে বিপুল আয়োজন চলিতেছে, তাহাতে শুধু বৈষ্ণব সমাজের নহে, হিন্দু সমাজের সকলেরই সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই মন্দির প্রতিষ্ঠায় মহাত্মা শিশিরকুমারের কিছু উপকার করা হইবে না। বাঙ্গালীজাতি আমরা যে মানুষ, আমরা প্রকৃত ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের আদর করিতে শিখিয়াছি, এ ক্ষেত্রে তাহাই আন্তরিকতা সহকারে দেখান হইবে।

এজন্য এই মহাত্মার স্মৃতিরক্ষায় উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভা বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। আশা করি, যাবতীয় ধর্ম্মসভা, রাজনৈতিক সভা এবং সাহিত্য সভা ইহাতে যোগদান করিবেন। কেবল তাহা নহে, মহাত্মা শিশিরকুমারের প্রতি যাহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তিনি যে ভাবে পারেন এই স্মৃতিরক্ষায় সাহায্য করিবেন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। সাহায্য অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাগ্যকুলের জমিদার ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায়, ১৬ নং বনমালী সরকারের গলি, হাটখোলা, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

১। মহাত্মা শিশিরকুমারের অপর একটী নাম বলরাম দাস। এই কারণে শিশিরকুমারের স্মৃতি স্থানের নাম হইয়াছে ;—"বলরাম ঘেরা"

২। এই বলরাম ঘেরার জন্য ১০।৩ (দশবিঘা তের কাঠা) জমি লওয়া হইয়াছে, আরও জমি লওয়ার প্রস্তাব চলিতেছে।